কিশোর কাহিনি সিরিজ

হাতে মাত্র তিনটে দিন

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

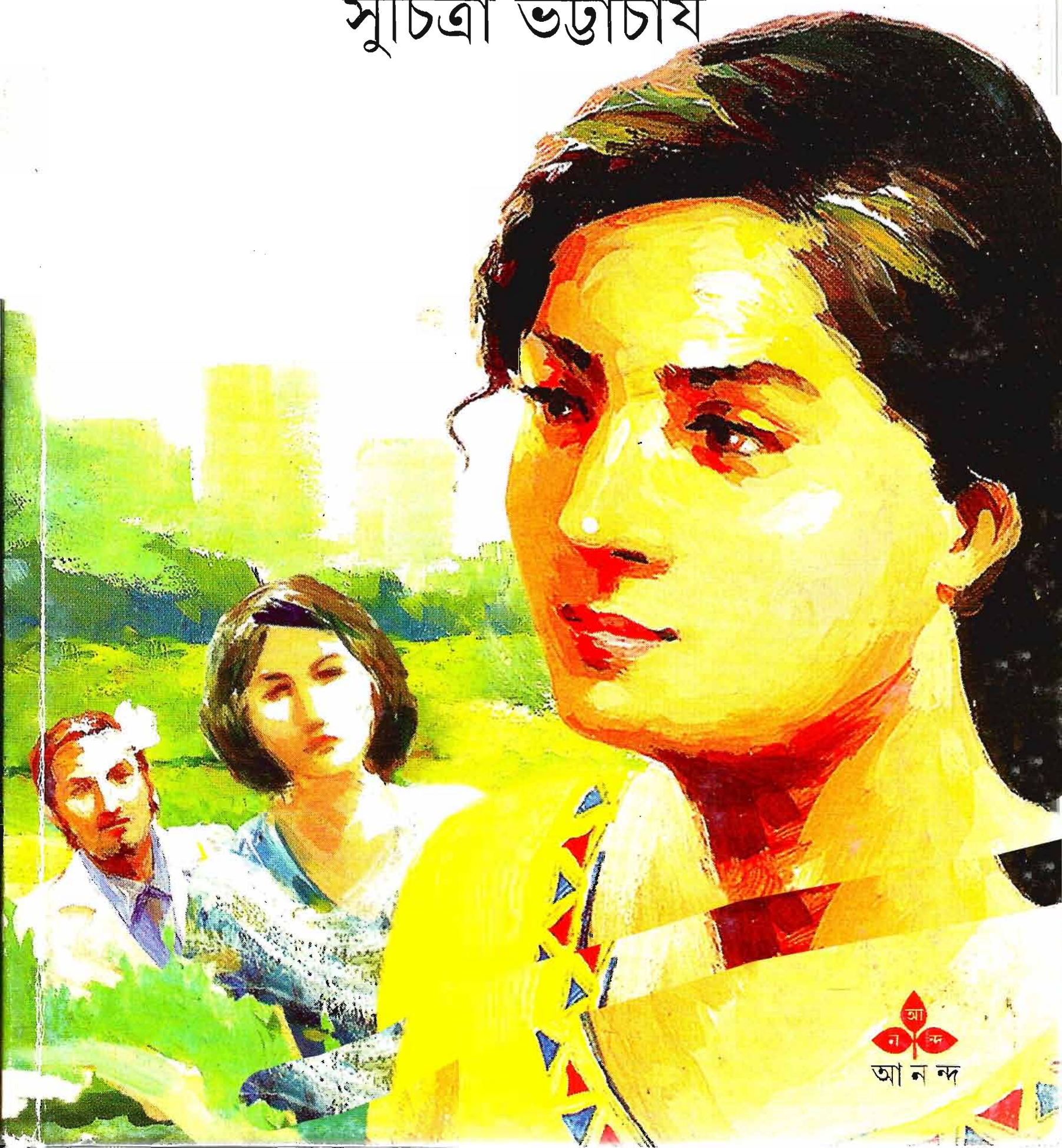

আনন্দ

হাতে মাত্র তিনটে দিন

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

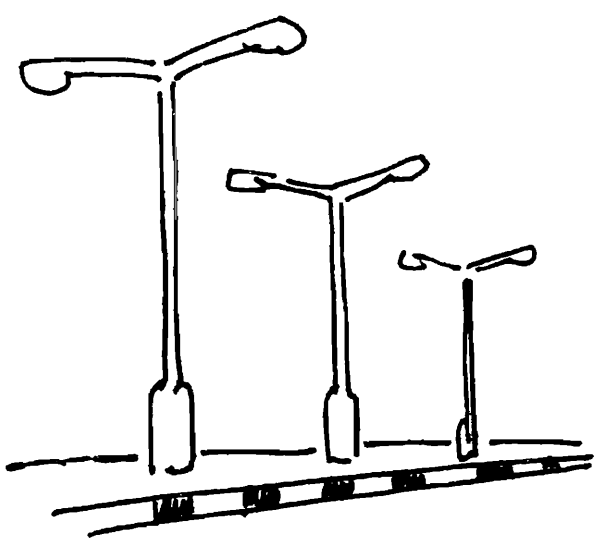

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: অমিতাভ চন্দ্র

আনন্দ

আদরের
অভিজ্ঞান ভট্টাচার্যকে

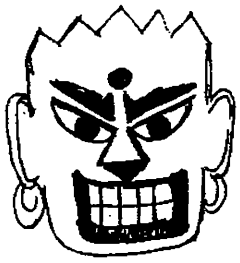

দরজা খুলেই টুপুরের দু'চোখ খুশিতে চকচক। পার্থমেসো ফিরল বাড়িতে, হাতে ইয়া এক প্লাস্টিকের ঝোলা। ভুরভুর সুগন্ধ বেরোচ্ছে ঝোলা থেকে। লোভনীয় খাবারের ঘ্রাণ।

টুপুর ভুরু নাচাল, "কী এনেছ গো?"

"জানবি, জানবি। অত তাড়া কীসের?" ডাইনিং টেবিলে ঝোলা নামিয়ে ধীরেসুস্থে জুতো ছাড়ল পার্থ। গ্রাম্ভারি গলায় বলল, "আজ নর্থ ক্যালকাটা গিয়েছিলাম, বুঝলি। তোদের হাতিবাগানের কাছেই। আমার এক ক্লায়েন্ট সেই কবে সুভেনির ছাপিয়েছে, এখনও পয়সা দেওয়ার নামটি নেই। ফোন করলেই বলে, নেক্সট উইক। কাঁহাতক সহ্য হয়, দিয়েছি আজ তার অফিসে হানা। আমায় সশরীরে দেখে এমন ঘাবড়েছে...!"

"অমনি পেমেন্ট দিয়ে দিল, তাই তো?"

"অর্ধেকটা। তাই বা কম কী বল? আমি তো আজ ফুটো কড়িটিও আশা করিনি।" পার্থ গাল ছড়িয়ে হাসল, "টাকাটা পেয়ে এত আনন্দ হল, সোজা চলে গেলাম উত্তর কলকাতার বিখ্যাত অ্যালেন্স কিচেনে। খাঁটি ঘিয়ে ভাজা চিকেন চপ আর প্রন কবিরাজি কিনে ফেললাম।"

"ওয়াও!" টুপুর প্রায় লাফিয়ে উঠল। প্যাকেটের গায়ে হাত বোলাতে-বোলাতে বলল, "এ তো এখনও গরমাগরম গো! সুদূর গ্রে স্ট্রিট থেকে উড়ে এলে নাকি?"

"ওড়াই বটে। মেট্রো ধরে সাঁ কালীঘাট, সেখান থেকে ট্যাক্সিতে

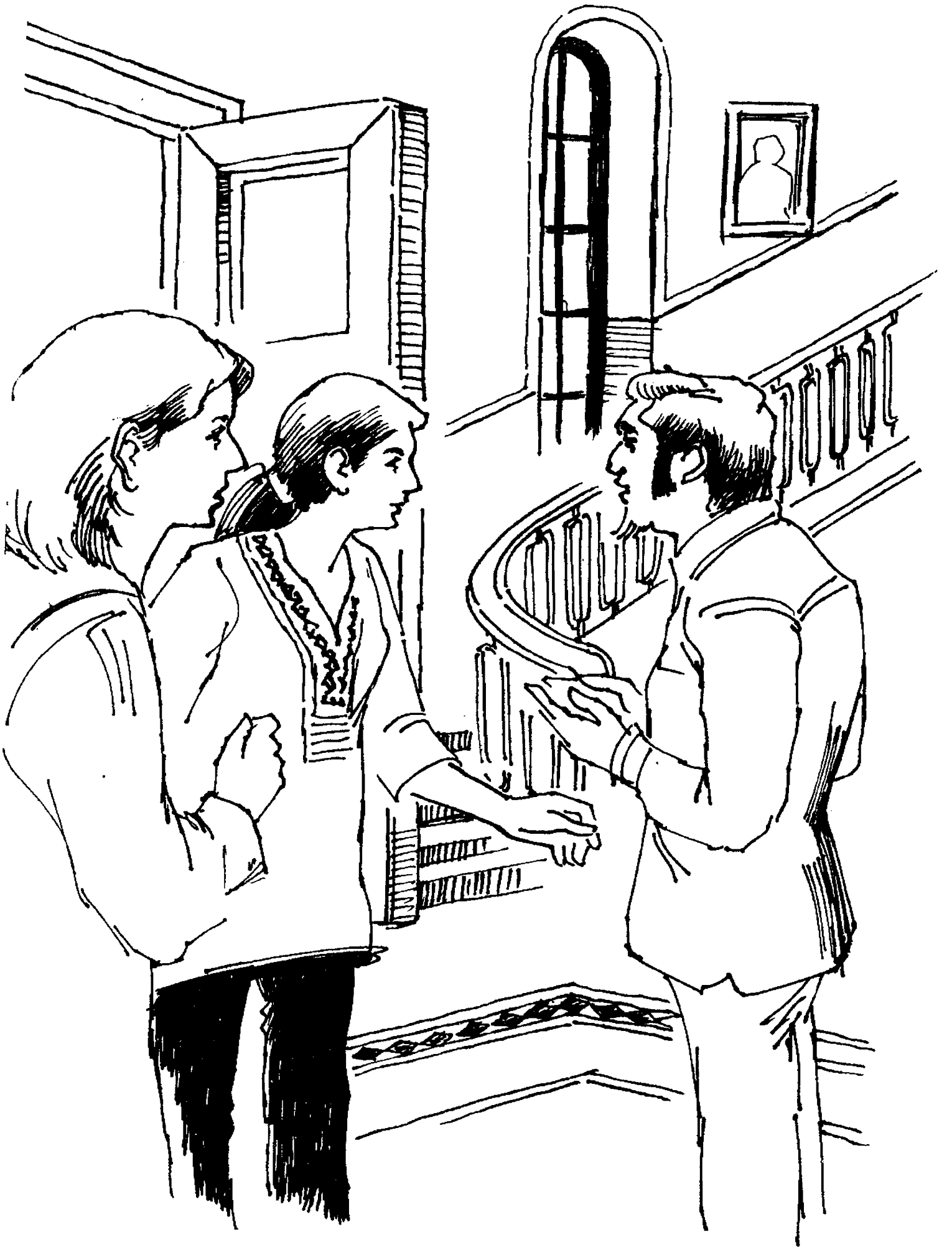

সোজা ঢাকুরিয়া।" পার্থ এদিক-ওদিক চোখ চালাল, "তোর মাসি কোথায় রে?"

"বুমবুমকে পড়াচ্ছে।"

"ভেরি গুড। চটপট দুটো প্লেট নিয়ে আয় তো। তোর মাসি টের পাওয়ার আগে দু'জনে দু'খানা চপ সাবাড় করে দিই।"

তা মিতিনমাসিকে ফাঁকি দেয় সাধ্য আছে পার্থমেসোর! গোয়েন্দা বলে কথা, ঠিক এসে গিয়েছে বিড়াল-পায়ে। টুপুর রান্নাঘর থেকে প্লেট আনার আগেই জারি হয়ে গেল নির্দেশ,"আগে হাত-মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে এসো, তারপর আহার।"

অগত্যা পার্থ বেজার মুখে বাথরুমে এবং মিতিন যথারীতি পাকা গৃহিণীর ভূমিকায়। চপ-কাটলেটগুলো বের করে পরিপাটি সাজিয়ে ফেলল প্লেটে। টুপুরকে কফির জল চড়াতে বলে কুচকুচ পেঁয়াজ-শসা কাটছে। পারতপক্ষে দোকানের স্যালাড খায় না মিতিন, কাউকে খেতেও দেয় না। বেশিক্ষণ কেটে রাখা শসা-পেঁয়াজে নাকি জীবাণু টানে খুব।

পার্থ পোশাক-টোশাক বদলে ফিরল ডাইনিং টেবিলে। একখানা চিকেন চপ তুলে নিয়ে পেল্লাই কামড় বসাল। তারিয়ে-তারিয়ে চিবোচ্ছে। সঙ্গে কফিতে চুমুক। পুলকিত স্বরে বলল, "আহা, বয়ে আনার পরিশ্রমটা সার্থক। বেড়ে বানিয়েছে কিন্তু।"

"কলকাতার এই সাবেকি দোকানগুলোর গুডউইল তো এমনি-এমনি গজায়নি।" মিতিনের টুকুস মন্তব্য, "এদের মাল-মেটিরিয়ালও এক নম্বর, হাতের কেরামতিও লা-জবাব।"

"তবে রোজ-রোজ তো অদ্দূর থেকে আনা যায় না।" পার্থ গলাখাঁকারি দিল, "মাঝে-মাঝে তো ঘরেও বানাতে পারো।"

"খেয়েদেয়ে কাজ নেই, আমি এখন চপ-কাটলেট ভাজব?"

"অসুবিধে কোথায়? বসেই তো আছ। টিকটিকিগিরির প্রতিভাটা নয় রান্নাঘরে লাগালে।"

মিতিনের হাতে সত্যিই এখন কাজ নেই। তার জন্য কোনও ছটফটানি আছে বলেও মনে হচ্ছে না। অ্যানুয়াল পরীক্ষার পর চারদিন হল এ বাড়িতে এসেছে টুপুর। এর মধ্যে একটি বারও কম্পিউটার পর্যন্ত খুলতে দেখল না মাসিকে। ফোনাফুনি নেই, ফাইল ঘাঁটাঘাঁটি নেই, বাইরে বেরোচ্ছে না, সারাদিন হয় গল্পের বইয়ে ডুবে আছে, নয়তো গান। চলছে অবিরাম রবীন্দ্রসংগীত কিংবা পুরনো আমলের হিন্দি গান। যে গানগুলো শুনলেই টুপুরের হাই ওঠে। রান্নাঘরেও মোটে ঢুকছে না মিতিনমাসি। আরতিদি যা রেঁধে দিয়ে যাচ্ছে তাই গিলে নিচ্ছে চুপচাপ। মাসিকে এত উদাসীন, এমন নিস্পৃহ জীবনে দেখেনি টুপুর।

তবু পার্থমেসোর খোঁচাটা টুপুরের ভাল লাগল না। বেকার মানুষকে কাজের খোঁটা দেওয়া কি উচিত? দেশে হঠাৎ চোর-ডাকাত কমে গেলে মাসি কী করবে?

রিনরিনে গলায় টুপুর প্রতিবাদ জানাল, "মিতিনমাসি মোটেই এখন বসে নেই মেসো। মগজটাকে কয়েক দিন রেস্ট দিচ্ছে শুধু।"

"দেখিস বাবা, বেশি বিশ্রামে মগজে না মরচে ধরে যায়।"

কী আশ্চর্য, এহেন টিপ্পনীতেও মিতিন দিব্যি নির্বিকার। কাসুন্দি ছুঁইয়ে-ছুঁইয়ে কবিরাজি কাটলেট খাচ্ছে। হঠাৎ কী মনে পড়তে থামল। একটা প্লেটে আধখানা কবিরাজি নিয়ে বলল, "দাঁড়া, এটা বুমবুমকে দিয়ে আসি। বেচারা দশমিকের অঙ্কে হাবুডুবু খাচ্ছে।"

মিতিন ঘরে যাওয়ামাত্র পার্থর খিকখিক হাসি, "দেখলি তো, তোর মাসি কেমন কায়দা করে কাটল?"

"কাটাকাটির কী আছে?"

"বুঝলি না? আজকাল আর কেউ ডাকছে না তো, তাই আঁতে লাগছে।"

"জেনেশুনে মাসিকে তা হলে হার্ট করছ কেন?"

"অ। তোরও গায়ে ফোসকা পড়ছে বুঝি?" পার্থর স্বরে কৌতুক। এক চুমুকে কফি শেষ করে বলল, "জব্বর একখানা চামচি হয়েছিস বটে মাসির। একজনকে ছ্যাঁকা দিলে অন্যজনের চামড়া জ্বলে।"

টুপুর ফোঁস করে উঠতে যাচ্ছিল, তার আগেই পার্থ ধাঁ। খবরের কাগজ মুখে সোফায় ধপাস। সুদোকু ছেড়ে ইদানীং আবার আগ্রহ বেড়েছে শব্দজব্দে, মন দিয়ে সমাধান করছে ধাঁধার।

ঠিক তখনই সেন্টারটেবিলে পড়ে থাকা মোবাইল ফোনে সুরেলা ঝংকার।

পার্থর ধ্যানে বিঘ্ন ঘটল। ভুরু কুঁচকে বলল, "তোর মাসির কাণ্ডটা দ্যাখ। এখানে মোবাইল ফেলে..., যা, দিয়ে আয় তো।"

মুঠোফোনখানা তুলে টুপুর খুদে মনিটরটা দেখল। নাম নেই, শুধু নাম্বার। অর্থাৎ অচেনা কেউ। মাসির ঘরের দিকে এগোতে-এগোতেই ফোনটা কানে চেপেছে, "হ্যালো?"

"আমি কী প্রজ্ঞাপারমিতা মুখার্জির সঙ্গে কথা বলছি?"

ঈষৎ জড়ানো গলা। যেন একটু কাঁপছেও। পরিষ্কার বাংলায় বললেও সামান্য অবাঙালি টান আছে উচ্চারণে।

টুপুর তাড়াতাড়ি বলল, "না, আমি ওঁর বোনঝি। আপনি কে বলছেন?"

"আমার নাম শেঠ রুস্তমজি জরিওয়ালা। ম্যাডাম আমাকে চিনবেন না। ওঁর সঙ্গে আমার একটা জরুরি দরকার আছে। একবার কথা বলা যাবে?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। নিশ্চয়ই।"

দৌড়ে গিয়ে মিতিনকে ফোনটা দিল টুপুর। আবছা একটা রহস্যের গন্ধ পেয়েছে, তাই নড়ল না। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শুনছে। মিতিনমাসির সংলাপ থেকে অবশ্য কিছুই আন্দাজ করার জো নেই। 'হুঁ, হ্যাঁ, ও আচ্ছা, ঠিক আছে' এই সবই আউড়ে যাচ্ছে

ক্রমাগত। শেষে অবশ্য গুছিয়ে নিজের ফ্ল্যাটের ডিরেকশনটা দিল। তারপর ফোন অফ করে পায়ে-পায়ে উঠে এল বাইরের ঘরে। নীরবে।

টুপুরও এসেছে পিছু-পিছু। কৌতূহল চাপতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে গো ভদ্রলোকের? ওই শেঠ রুস্তমজি না কী যেন...!"

"ঠিক বোঝা গেল না। ভদ্রলোকের নাকি খুব বিপদ। এক্ষুনি একবার ওঁর বাড়ি যাওয়ার জন্য খুব অনুরোধ করছিলেন।"

"কোথায় থাকেন?"

"চৌরঙ্গিতে। হ্যানোভার কোর্টে।"

"তুমি যাবে এখন?"

"হুঁ। ভদ্রলোক গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছেন। দেখি গিয়ে, শেঠ রুস্তমজি জরিওয়ালা কী গাড্ডায় পড়লেন।"

পার্থ কান খাড়া করে শুনছিল। চোখ গোল-গোল করে বলল, "শেঠ রুস্তমজি জরিওয়ালা? সে তো খুব ধনী ব্যবসায়ী!"

"ইয়েস। ফেমাস কার্পেট মার্চেন্ট। গোটা ইন্ডিয়ায় ওঁদের শোরুম আছে।"

"জানি তো। ওদের ব্র্যান্ডনেম 'ফ্যান্টাসি'।"

টুপুর অবাক মুখে বলল, "কার্পেট ব্যবসায়ীর এমন কী ঘটল যে, মিতিনমাসিকে এক্ষুনি দরকার?"

"অনেক কিছুই হতে পারে।" পার্থ খবরের কাগজখানা ভাঁজ করে রাখল। বিজ্ঞ ভঙ্গিতে বলল, "হয়তো সম্পত্তি নিয়ে বখেড়া। হয়তো জাল উইলটুইল বেরিয়েছে।"

"তার জন্য এমন অসময়ে...! গাড়িটাড়ি পাঠিয়ে...?"

"তা হলে নির্ঘাত মণিমাণিক্য কিছু খোওয়া গিয়েছে। রুস্তমজি নাম শুনেই তো বুঝছিস ভদ্রলোক পারসি? ওঁদের ধনদৌলতের

কোনও সীমা-পরিসীমা নেই রে। হয়তো পূর্বপুরুষের টেনিসবল সাইজের চুনি ছিল, কিংবা প্ল্যাটিনামের মুকুট...!"

"পারসিরা সবাই খুব বড়লোক হয় বুঝি?"

"দু'-চার পিস গরিব থাকতেও পারে, আমি দেখিনি। শিক্ষাদীক্ষাই বল, কি ব্যাবসা-বাণিজ্য, সবেতেই ওরা ঢের এগিয়ে। গুণ আছে ওদের। এমনি-এমনি কি সেই পারস্যদেশ... এখন যাকে বলে ইরান... সেখান থেকে এসে এ দেশে জাঁকিয়ে বসতে পারে?"

"তা বটে। বিদেশ-বিভুঁইয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করা তো চাট্টিখানি কাজ নয়।"

"ওরা ভারতকে আর বিদেশ বলে ভাবেই না। ইনফ্যাক্ট, এ দেশে পা রাখার পর থেকেই ওরা ইন্ডিয়ান হতে চেয়েছে এবং হয়েও গিয়েছে। বড় ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট থেকে শুরু করে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ল-ইয়ার, কবি, সাংবাদিক, খেলোয়াড়, সব লাইনেই ওরা সফল। স্বাধীনতা সংগ্রামেও ওরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছে। জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট তো পারসি, দাদাভাই নওরোজি। মাদাম কামা নামে এক পারসি মহিলা তো ইউরোপে পালিয়ে গিয়ে সেখান থেকে বিপ্লবীদের অস্ত্র সাপ্লাই করতেন। দু'-দু'খানা কাগজ বের করতেন জেনেভায় বসে। 'বন্দে মাতরম' আর 'তলোয়ার'।"

"ইন্টারেস্টিং!"

"ইন্ডিয়ায় পারসিদের প্রথম আগমনের কাহিনিটা আরও ইন্টারেস্টিং। নিশ্চয়ই জানিস না!"

"না মানে... ইতিহাস বইয়ে তো নেই...!"

"জি কে-টা আরও বাড়া।" পার্থ সোফায় হেলান দিল। চোখ নাচিয়ে বলল, "পারসিদের সম্পর্কে কতটুকু কী জানিস বল তো?"

"এই যেমন ধরো, ওদের ধর্মগুরুর নাম জরথুস্ত্র। ওরা আগুনকে পুজো করে।"

"একদম ভুল ধারণা। পারসিরা অগ্নির উপাসক নয়। তবে ওরা আগুনকে খুব পবিত্র বলে মানে। ওদের মন্দিরে আগুনকে সযত্নে সংরক্ষণ করে রাখে।" পার্থ সেন্টারটেবিলে পা তুলে দিল, "যাক গে, ঠিকঠাক ইনফরমেশনগুলো ব্রেনে পুরে নে। অ্যারাউন্ড সাতশো খ্রিস্টাব্দে পারস্য আক্রমণ করেছিল আরবরা। তখন জরথুস্ত্রবাদী পারসিদের অনেকেই বাড়িঘর ছেড়ে পালায়। প্রথমে তারা আশ্রয় নিয়েছিল বর্তমান ইরানের খোরাসানে। পাহাড়ি অঞ্চলে। সেখানে শ'খানেক বছর কাটিয়ে বাসা বাঁধে পারস্য উপসাগর উপকূলে। হরমুজ প্রদেশে। বছর পনেরো পর সাত-সাতখানা জাহাজে চড়ে তারা হাজির হয় ভারতের উত্তর-পশ্চিম উপকূলে। গুজরাতের পাশে। দিউতে। তখন ওখানে রাজা ছিলেন জদি রানা। পাক্কা উনিশটা বছর দিউয়ে প্রায় ঘাপটি মেরে ছিল পারসিরা। হঠাৎ একদিন ওদের ওপর নজর পড়ল রাজার। অমনি রাজসভায় ডাকলেন পারসি প্রধানকে। বললেন, 'আপনারা কি এ দেশে পাকাপাকি থাকতে চান?' প্রধানের সঙ্গে এক পারসি পুরোহিতও এসেছিলেন সভায়। তাঁর নাম নেরিয়োসং। তিনি বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'যদি আপনি অনুমতি দেন...।' শুনে জদি রানা পাঁচ-পাঁচখানা শর্ত দিলেন পারসিদের।"

"কী শর্ত?"

"প্রথমত, তাদের ধর্মটা যে ঠিক কী, রাজাকে ভাল করে বোঝাতে হবে। দু'নম্বর শর্ত, নিজেদের ভাষা ছেড়ে এখানকার ভাষায় কথা বলতে হবে। তিন নম্বর, পারসি মেয়েরা যেন ভারতীয় পোশাক পরে। চার নম্বর, কাছে কোনও অস্ত্রশস্ত্র রাখা চলবে না। আর পাঁচ নম্বরটা ভারী মজার। বিয়ের শোভাযাত্রা করতে হবে রাত্তিরে। মানে অন্ধকার নামার পর।"

"এমন আজব শর্ত কেন?"

"রাজারাজড়ার খেয়াল। যাই হোক, ওরা কিন্তু প্রতিটি শর্ত অক্ষরে-অক্ষরে মেনেছিল। ক্রমে-ক্রমে ওরা অ্যাইসান ভারতীয় বনে গেল... এখন মেয়েরা যেভাবে কুঁচি দিয়ে শাড়ি পরে, সে তো পারসি মহিলাদের নকল করে। আমাদের বেঙ্গলে প্রথম কে ওই স্টাইলে শাড়ি পরেছিল জানিস? জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। রবি ঠাকুরের মেজবউদি। প্রথম ভারতীয় আই সি এস সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের...!"

"তোমার জ্ঞানের ঝাঁপিটা এবার বন্ধ করবে?" অনেকক্ষণ পর মিতিনের গলা বেজে উঠল। ঘুরে টুপুরকে বলল, "তুই কি মেসোর গল্পই গিলবি? না আমার সঙ্গে বেরোবি?"

এ যে মেঘ না চাইতেই জল! টুপুর তোতলা গলায় বলল, "যে-যে-যে-যেতেই পারি।"

"চটপট তা হলে তৈরি হয়ে নে। এক্ষুনি গাড়ি এসে যাবে।"

মিতিন শোওয়ার ঘরের দিকে এগোতে গিয়েও কী ভেবে ঘুরে দাঁড়াল। পার্থকে বলল, "আমার ফিরতে সম্ভবত দেরি হবে।"

"সে আমি বুঝে গিয়েছি। বুমবুমকে খাইয়ে দিতে হবে, তাই তো?"

"চাইলে নিজেও ডিনার সেরে নিয়ো।"

"দেখা যাবেখ'ন।" পার্থ মিটিমিটি হাসল। চোখ টিপে বলল, "যাক, শেষ পর্যন্ত তবে বেকার দশা ঘুচল, অ্যাঁ?"

"তো?"

"রোদ্দুর উঠেছে দেখলেই খড় শুকিয়ে নিয়ো কিন্তু।"

"মানে?"

"কেস যদি টেক-আপ করো, গোড়াতেই অ্যাডভান্স নেবে। রেটটা একটু চড়ার দিকে রেখো। যে জিনিস হারিয়েছে, অন্তত তার দামের ফাইভ পার্সেন্ট।"

"ভুল করছ। রুস্তমজির হিরে-জহরত কিছু খোয়া যায়নি।"

"কী করে শিয়োর হলে?"

"ভদ্রলোকের গলা শুনে। এমন নার্ভাস স্বর...!" মিতিন মাথা দোলাল, "উহুঁ, মিস্টার জরিওয়ালার বিপদ অনেক-অনেক বেশি গভীর।"

"যেমন? কোনও আনন্যাচারাল ডেথ? খুনটুন গোছের কিছু?"

"তা হলে তো আগে পুলিশ ডাকত।"

"আর কী হতে পারে?"

"সহজ উত্তর একটা আছে। হয়তো আমার অনুমানটা ভুলও নয়।"

"কী বলো তো?"

"ভাবো। ভাবতেই থাকো। দেখো, মাথা চুলকে-চুলকে যেন টাক না পড়ে যায়।"

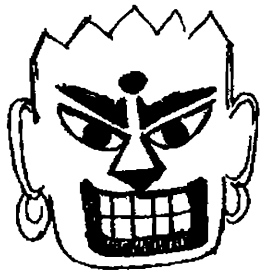

নিঃশব্দে ছুটছিল গাড়িটা। ধবধবে সাদা বিদেশি মোটরকার। কলকাতার রাস্তায় এই মডেলের গাড়ি খুব বেশি চোখে পড়ে না। চেহারায় যেন গর্বিত রাজহাঁসের ভাব। গাড়ির সিটগুলোও কী নরম, আহা। মৃদু এ সি চলছে অন্দরে। যতটুকুতে বেশ আরাম হয়, ঠিক ততটুকুই। ড্যাশবোর্ডের দামি পারফিউম হালকা সৌরভ ছড়াচ্ছে। সবে রাত আটটা, কলকাতার রাস্তায় এখনও যথেষ্ট কোলাহল, কিন্তু কাচঘেরা শকটে বসে কিচ্ছুটি টের পাওয়ার জো নেই। গাড়ির চলনও ভারী মসৃণ। ঝাঁকুনি ছাড়াই দিব্যি পার হচ্ছে পথের খানাখন্দ।

টুপুরের একটা ছোট্ট শ্বাস পড়ল। ইস, মিতিনমাসি যে কবে একখানা এরকম গাড়ি কিনবে!

সুখ-সুখ আবেশের মধ্যেই গাড়ি পৌঁছোল এক প্রাচীন অট্টালিকায়। ড্রাইভারটি ভারী ফিটফাট। নিখুঁত কামানো গাল, সরু গোঁফ, পরনে আকাশ-নীল উর্দি, মাথায় টুপি। বয়স বছর বত্রিশ-তেত্রিশ, চেহারাতে একটা চেকনাই আছে। আদবকায়দাও জানে। গাড়ি চালানোর সময় দু'বার মোবাইল বেজেছিল, ধরে হাউহাউ করে কথা বলেনি। দু'বারই নম্বর দেখে কেটে দিয়েছে লাইন। এখনও ইঞ্জিন বন্ধ করে ত্বরিত পায়ে নেমে এল সিট থেকে। মিতিন-টুপুরের দরজা খুলে দাঁড়াল। সসম্মানে বলল, "সেকেন্ড ফ্লোরে চলে যান। লিফ্‌ট আছে। তিনতলায় ডান দিকে সাহেবের ফ্ল্যাট।"

গাড়ি থেকে নেমে অভ্যেস মতোই এদিক-ওদিক চোখ চালাল টুপুর। দেখল, মূল ফটক থেকে তারা অনেকটা ভিতরে দাঁড়িয়ে। গেটের ওপারে রাজপথ, তার ওপারে সেন্ট পল্‌স ক্যাথিড্রালের চূড়া দেখা যাচ্ছে। ফটক আর অট্টালিকার মাঝে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। ছায়া-ছায়া অন্ধকার মাখা। আগে এখানে মূর্তিটুর্তি বসানো ফোয়ারা ছিল বোধ হয়, এখন নেহাতই ভগ্নস্তূপ। টিকে আছে শুধু লোহার ঘেরাটোপখানা।

জবরদস্ত ইমারতে প্রবেশের মুখে চার ধাপ সিঁড়ি। মিতিনের সঙ্গে সিঁড়ি ধরে উঠতে-উঠতে টুপুর বলল, "বাড়িটা অন্তত এক-দেড়শো বছরের পুরনো, কী বলো?"

"একশো আশি পেরিয়েছে। আঠেরোশো বাইশে তৈরি।"

"জানলে কী করে?"

"ফটকে লেখা আছে। সারাক্ষণ হাঁ করে থাকিস না, চোখ-কানটাও খোলা রাখ।"

"সরি। আচ্ছা, বাড়িটার নাম 'হ্যানোভার কোর্ট' কেন গো? ওই নামের কোনও সাহেবের বাড়ি ছিল কি এটা?"

"সম্ভবত না। ওই সময় রাজারাজড়াদের নামে বাড়ির নামকরণের

একটা চল ছিল। আঠেরোশো বাইশে ইংল্যান্ডে রাজত্ব করত হ্যানোভার বংশ। বোধহয় সেই সুবাদেই...!"

"ও।"

কথায়-কথায় মাসি-বোনঝি লিফ্‌টের দরজায়। কোলাপসিব্‌ল গেট লাগানো প্রাচীন আমলের ঢাউস লিফ্‌ট। উঠলও ভারী ধীর লয়ে।

বেরিয়েই অদূরে রুস্তমজির নেমপ্লেট বসানো প্রকাণ্ড দরজা। ডোরবেল বাজানোমাত্র কপাট খুলে গিয়েছে। একজন বছর চল্লিশ-বিয়াল্লিশের সুদর্শন ভদ্রলোক খানিকটা যেন উদ্‌ভ্রান্ত চোখে তাকাচ্ছেন এদিক-ওদিক। চওড়া করিডরখানা শুনশান দেখে বুঝি বা স্বস্তি পেলেন সামান্য। তাড়াহুড়োর স্বরে বললেন, "আসুন। প্লিজ, কাম ইনসাইড।"

মিতিনরা ঢোকামাত্র বন্ধ হয়ে গেল দরজা। ভদ্রলোক হাতজোড় করে মিতিনকে বললেন, "আমিই রুস্তমজি। আপনি নিশ্চয়ই...?"

"প্রজ্ঞাপারমিতা মুখার্জি।" মিতিন প্রতিনমস্কার জানাল। টুপুরকে দেখিয়ে বলল, "মাই নিস। এবং সহকারীও বটে।"

রুস্তমজি যেন শুনেও শুনলেন না। টানা লম্বা প্যাসেজ ধরে হাঁটছেন মিতিনদের নিয়ে। অতিকায় এক সুসজ্জিত ড্রয়িংহলে ঢুকে থামলেন। কারুকাজ করা ভারী সোফায় আসন গ্রহণ করতে বললেন মিতিনদের। নিজেও বসলেন মুখোমুখি। এক রাজকীয় ডিভানে। মিতিন কোনও প্রশ্ন করার আগেই বলে উঠলেন, "আপনারা যখন এলেন... লিফ্‌টম্যান ছিল কি?"

"না তো।"

"আর কেউ?"

"উঁহু। শুধু আমরা দু'জনেই তো...!"

"দ্যাটস গুড। দ্যাটস বেটার।"

"আপনার বিপদটা বোধহয় অনুমান করতে পারছি।" মিতিন সোফায় হেলান দিল। তার চোখ সার্চলাইটের মতো ঘুরছে রুস্তমজির মুখমণ্ডলে। হঠাৎই জিজ্ঞেস করল, "কে কিডন্যাপ্‌ড হয়েছে? আপনার ছেলে? নাকি মেয়ে?"

"আমার একমাত্র ছেলে। রনি। আজই বিকেলে...।" রুস্তমজি ঢোক গিললেন, "আপনি বুঝে ফেলেছেন?"

"এ তো ভেরি সিম্প্‌ল গেস মিস্টার জরিওয়ালা। একমাত্র অপহরণের ক্ষেত্রেই বাবা-মায়েরা ব্যাপারটাকে সাধ্যমতো গোপন রাখতে চায়।"

"হুম।" রুস্তমজির মুখটা ভারী শুকনো দেখাল। ধরা-ধরা গলায় বললেন, "বুঝছেনই তো, ছেলের লাইফ অ্যান্ড ডেথের প্রশ্ন।"

"পুলিশকেও জানাননি নিশ্চয়ই?"

"প্রশ্নই আসে না। ওরা যেভাবে আমায় শাসাল...!"

"অর্থাৎ অপহরণকারীদের ফোনকল আপনি পেয়েছেন?"

"না হলে জানব কী করে রনিকে আটকে রেখেছে! ওরা টাকা চায়। এক কোটি।"

টুপুর প্রায় আঁতকে উঠল, "এক কো..ও..ও..টি?"

"আগামী বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে টাকাটা দিতে হবে। তা হলেই আমি রনিকে ফেরত পাব। আমি ওদের চাহিদা মেটাতে রাজি হয়েছি।"

মিতিন গম্ভীর স্বরে বলল, "টাকা যখন দেবেনই স্থির করেছেন, আমাকে ডাকলেন কেন?"

রুস্তমজি একটুক্ষণ চুপ। তারপর গলা ঝেড়ে বললেন, "দেখুন ম্যাডাম, ঈশ্বরের কৃপায় ব্যাবসাসূত্রে আমি মোটামুটি অর্থবান। এক কোটি টাকা তেমন ছোট অঙ্ক নয় বটে, তবে আমার কাছে খুব

বেশিও নয়। রনির প্রাণের বিনিময়ে ওই টাকা আমি ব্যয় করতে প্রস্তুত। কিন্তু...!"

"কিন্তু কী?"

"আমি একজন ধর্মপ্রাণ পারসি। যতটা সম্ভব মহান জরথুস্ত্রের অনুশাসন মেনে চলি। তিনি বলেছেন, শুভ-অশুভের লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত শুভই জেতে। এবং অশুভকে সাজা পেতে হয়। অন্যায় যে করেছে তাকে শাস্তি পাওয়ানোটাই ধর্মপ্রাণ পারসির কর্তব্য। এতেই আমাদের ঈশ্বর অর্থাৎ আহুরমাজদা সন্তুষ্ট হন।"

"বুঝেছি। আপনি চান অপহরণকারীরা ধরা পড়ুক। তাই তো?"

"হ্যাঁ ম্যাডাম। টাকা যাক ক্ষতি নেই। আমি আমার রনিকেও চাই, আর অহরিমান অর্থাৎ শয়তানের সেই অনুচরদের শাস্তিও চাই। তেমন একটা শোরগোল না করে যাতে ওদের পাকড়াও করা যায় তার জন্যই আমি আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। আমার স্ত্রী পইপই করে মানা করেছিল, তবুও...!"

মিতিনের কপালে চিন্তার ভাঁজ। একবার দেখল টুপুরকে, আবার কী যেন ভাবল। মাথা নেড়ে বলল, "ওকে! নো প্রবলেম। চ্যালেঞ্জটা আমি নিচ্ছি।"

"পারবেন তা হলে লোকগুলোকে ধরতে? কথা দিচ্ছেন?"

"দেখা যাক। চেষ্টা তো একটা করি।" মিতিন সোজা হয়ে বসল, "ঘটনাটা ঠিক কীভাবে, কোথায় ঘটেছে আগে খুলে বলুন।"

"আজ বিকেলে... রনির স্কুল ছুটির পর... আমি অবশ্য খবরটা পেলাম সন্ধে নাগাদ।" রুস্তমজিকে ভারী বিচলিত দেখাল, "মানে কোত্থেকে যে শুরু করি...!"

"ঘাবড়াবেন না। আমি আপনাকে প্রশ্ন করছি, আপনি পরপর জবাব দিয়ে যান।" মিতিন সামান্য ঝুঁকল। দেখাদেখি টুপুরও। মিতিন জিজ্ঞেস করল, "আপনার ছেলের বয়স কত?"

"আট। গত মাসে ওর এইট্‌থ বার্থডে গিয়েছে।"

"কোন ক্লাসে পড়ে? কোন স্কুলে?"

"সেন্ট পিটার্স। এই তো সবে ফোরে উঠল।"

"যাতায়াত করে কীভাবে?"

"বাড়ির গাড়িতে। আপনি যে গাড়িতে এলেন, সেটাতেই...!"

"আপনার কি এই একটিই গাড়ি?"

"না। একটা হন্ডা সিটিও আছে। তবে রনি বি এম ডব্লিউটা পছন্দ করে বলে বিকেলেও অফিস থেকে ওটাই পাঠিয়ে দিই। রনিকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গাড়ি আবার অফিসে চলে আসে।"

"আজও নিশ্চয়ই গিয়েছিল গাড়ি?"

"হ্যাঁ। অশোক তো বললেন আড়াইটেতেই...!"

"অশোক কে? আপনার ড্রাইভার?"

"না। আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি। অশোক মজুমদার। এইসব টুকিটাকি ব্যাপার অশোকবাবুই হ্যান্ডেল করেন। রোজই আড়াইটে নাগাদ গাড়িটা উনি রওনা করিয়ে দেন। আমার অফিস ক্যামাক স্ট্রিটে, রনির স্কুল মৌলালিতে। ছুটি হয় তিনটেয়। প্রাইমারি সেকশন তো, তাই এক ঘণ্টা আগে। রোজই মোটামুটি ঠিক সময়ে স্কুলে পৌঁছে যায় গাড়ি। দু'-চার মিনিট দেরি হলে রনি অপেক্ষা করে। ওদের স্কুলের নিয়মকানুন খুব কড়া। ড্রাইভার গিয়ে আইডেন্টিটি কার্ড না দেখালে দরোয়ান বাচ্চাকে ছাড়ে না। আজ ড্রাইভার গিয়ে শোনে, রনি আগেই চলে গিয়েছে।"

"কী করে স্কুল ছাড়ল? আই-ডি কার্ড ছাড়া?"

"সেখানেই তো জটটা পেকেছে। রনিকে না পেয়ে ড্রাইভার প্রায় পড়িমড়ি করে এসে লীলাকে, আই মিন রনির মাকে আগে রিপোর্ট করে। লীলাও হতবাক। সঙ্গে-সঙ্গে স্কুলে ফোন করেছে। এবং আশ্চর্য কাণ্ড, রনিদের প্রিন্সিপাল-ম্যাডাম খোঁজ নিয়ে জানান,

দরোয়ান নাকি স্কুলের নিয়ম মাফিক আইডেন্টিটি কার্ড দেখেই রনিকে ছেড়েছে।"

"সে কী? আই-ডি কার্ড দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছে?"

"স্কুলের তো তাই বক্তব্য।"

"হুম। তারপর?"

"তারপর আর কী, লীলার প্রায় পাগলের মতো অবস্থা। আমায় বহুবার ফোন করেছিল। কিন্তু আমি তখন এমন ব্যস্ত...! সেল্‌স ম্যানেজারদের নিয়ে মিটিং চলছিল... মোবাইলটা সুইচ্‌ড অফ রেখেছিলাম। আমাকে না পেয়ে শেষে লীলা নিজেই দৌড়েছিল স্কুলে।"

"ম্যাডাম তো অফিসের লাইনেও চেষ্টা করতে পারতেন!"

"লীলার বোধহয় তখন মাথায় আসেনি। এমন পাজল্‌ড হয়ে গিয়েছিল...! সত্যি বলতে কী, লীলার অতগুলো মিস্‌ড কল দেখে ফোন করে যখন ঘটনাটা শুনলাম, আমারই হাত-পা ছেড়ে যাওয়ার দশা। সঙ্গে-সঙ্গে আমিও কাজকর্ম ফেলে বাড়ি ছুটেছি।"

"ম্যাডাম তখন বাড়িতে?"

"জাস্ট ফিরেছে। স্কুলে দরোয়ান ছাড়া কাউকে তো পায়নি। বড়দেরও তার অনেক আগেই ছুটি হয়ে গিয়েছে। এবং ওই একই কথা আউড়ে গিয়েছে দরোয়ান। আই-ডি কার্ড দেখেই নাকি সে...!" রুস্তমজি বড় করে একটা শ্বাস টানলেন, "রনিকে না পেয়ে লীলা প্রায় পাথর তখন। আমাকে দেখে এমন ডুকরে কেঁদে উঠল...! তাকে সামলাব, না পুলিশে খবর দেব ভেবে পাচ্ছি না...! ঠিক সেই সময়েই ফোনটা এল।"

"মোবাইলে?"

"না। ল্যান্ডলাইনে। নাম্বারটা কলার লিস্টে উঠেছে।" হাত বাড়িয়ে সাইডটেবিল থেকে হ্যান্ডসেটখানা তুললেন রুস্তমজি। বোতাম টিপে নাম্বারটা বের করে মিতিনকে বাড়িয়ে দিলেন।

চোখ কুঁচকে নাম্বারটা দেখল মিতিন। টুপুরকে বলল, "নোট করে নে।"

রুস্তমজি বললেন, "ওই নাম্বার থেকে কি কিছু ট্রেস করা যাবে?"

"সম্ভাবনা কম। এটা পাবলিক বুথের নাম্বার।" বলে মিতিন আবার ঝুঁকেছে, "ফোনে এগ্‌জ্যাক্টলি কী বলল?"

"প্রথমে তো ফোনটা লীলা তুলেছিল। ওদিক থেকে হুমকি শুনেই লীলা কাঁপতে-কাঁপতে আমায় রিসিভার দিয়ে দিল। আমার গলা পেয়ে লোকটা ফের থ্রেট্‌ন করল, 'কাল সকাল আটটার মধ্যে পঞ্চাশ লাখ চাই।' নইলে রনিকে আর ফেরত পাব না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'রনি যে আপনার কাছেই আছে, প্রমাণ কী?' লোকটা তখন রনির গলাও শুনিয়ে দিল। খুব কাঁদছিল ছেলেটা। আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল ম্যাডাম। তবু মরিয়া হয়ে বললাম, 'এই রাত্তিরেই নগদ পঞ্চাশ লাখ জোগাড় করব কোত্থেকে? আমার একটু সময় চাই।"

"রাজি হল?"

"লোকটা তখন আর-একজনের সঙ্গে বোধহয় আলোচনা করল। দু'জনেরই গলা শুনতে পেয়েছি আমি। তারপর খানিকক্ষণ কোনও শব্দ নেই। সম্ভবত মাউথপিস চেপে রেখেছিল হাত দিয়ে। অ্যাট লাস্ট আমাকে জানাল, সে সেভেনটি টু আওয়ার্স টাইম দিতে পারে, তবে টাকা চাই পুরো ওয়ান ক্রোড়। আমি আর কোনও দরাদরি করিনি। কারণ, পঞ্চাশ লাখ টাকার চেয়ে আড়াই দিন সময় আমার কাছে অনেক বেশি মূল্যবান। এতে হয়তো শয়তানদের ধরতে সুবিধে হবে আমাদের।"

"কিন্তু বিপদের ঝুঁকিও তো বেড়ে গেল। ছেলেটা আরও আড়াই দিন কিডন্যাপারদের খপ্পরে থাকবে।"

"দেখুন ম্যাডাম, আমি ব্যাবসা করে খাই। একটু আধটু মানুষ চিনি। যারা ছেলের বাবার প্রেশারে বেশি সময় দিতে রাজি হয়, আর তার এগেনস্টে ডবল টাকা চায়, তারা নিজেদের স্বার্থেই আমার রনিকে ঠিকঠাক রাখবে।"

"হুঁ।" মিতিন মাথা দোলাল। অল্প সময় নিয়ে বলল, "একটা প্রশ্ন। আপনি অফিস থেকে কি হন্ডা সিটি ধরে ফিরেছেন আজ?"

"না। ট্যাক্সি নিয়েছিলাম। ওই গাড়িটা তো বাড়িতে ছিল। বাড়িতেই থাকে। লীলার জন্য।"

"তারও ড্রাইভার আছে নিশ্চয়ই?"

"সে এখন ছুটিতে। গত সপ্তাহে দেশে গিয়েছে।"

"কোথায় দেশ?"

"বিহার। জাহানাবাদ।"

"বদলি ড্রাইভার নেই?"

"প্রয়োজন হয় না। দরকারে লীলা নিজেই ড্রাইভ করে।"

"আপনার বি এম ডব্লিউর ড্রাইভারটি নিশ্চয়ই বিশ্বস্ত?"

"তারক ভাল ছেলে। অশোক ওকে চমৎকার রিক্রুট করেছেন। রনিকে না দেখতে পেয়ে খুব ভেঙে পড়েছে তারক। রনির সঙ্গে খুব ভাব তো। ছেলেটা আজ ভয়ও পেয়েছে ভীষণ।"

"কেন?"

"ভাবছে, বোধহয় চাকরিটা গেল।"

"রনিকে নিয়ে আসার কার্ডটা কি তারকের কাছেই থাকে?"

"হ্যাঁ। আজ অবশ্য লীলাকে দিয়ে দিয়েছে।"

মিতিন আবার একটা কী প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল, থেমে গেল। হলের ও প্রান্তে দরজায় এক মহিলা। পরনে প্রিন্টেড সালোয়ার, খাটো কামিজ। পাতিয়ালা সুট। বয়স বছর পঁয়ত্রিশ। টকটকে ফরসা রং, সোনালি রং-করা চুল, তীক্ষ্ণ নাক এবং বেশ দীর্ঘাঙ্গি। সুন্দর

মুখখানা বিশ্রীরকম ফুলে আছে, বড়-বড় চোখ দুটো জবাফুলের মতো লাল।

রুস্তমজি আলাপ করিয়ে দিতে যাচ্ছিলেন মহিলার সঙ্গে, তার আগে টলমল পায়ে ছুটে এলেন মহিলা। মিতিনের পাশে ধপ করে বসে পড়লেন। কোনও প্রস্তুতির অবকাশ না দিয়েই খপ করে চেপে ধরলেন মিতিনের হাতখানা। তার পরেই আচমকা আর্তনাদ, "দোহাই আপনার, লোকগুলোকে ধরতে গিয়ে রনির যেন কোনও বিপদ না ঘটে। রুস্তমজি যাই বলুক, আমি শুধু আমার ছেলে ফেরত চাই।"

মিতিন হাত রাখল লীলার পিঠে। অঝোরে কেঁদে চলেছেন লীলা। থামছেই না কান্না।

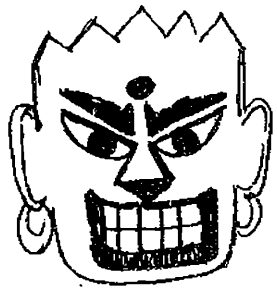

দেওয়ালে বেশ কয়েকখানা ছবি। তেল রঙে আঁকা। কোনও অয়েল পেন্টিং-এ পাগড়িওয়ালা পুরু গোঁফ জাঁদরেল পুরুষ, কোনওটায় বা হ্যাট-কোট পরা এদেশি সাহেব। চোগা চাপকানধারীও আছেন একজন। তিনজন মহিলার ছবিও দৃশ্যমান। তাঁদের প্রত্যেকেরই পরনে শাড়ি আর কায়দার ব্লাউজ। প্রতিটি তৈলচিত্রই বলে দেয়, রুস্তমজি অভিজাত ঘরানার মানুষ।

টুপুর চোরা চোখে ছবিগুলো দেখছিল। রুস্তমজির কাজের মেয়েটি কফি রেখে গিয়েছে, সঙ্গে বিস্কুট আর কাজুবাদাম। কফিমগ এখনও হাতে তোলেনি টুপুর। অস্বস্তি হচ্ছে। অজস্র বহুমূল্য শো-পিসে সাজানো, পেল্লাই একখানা গ্র্যান্ড পিয়ানো শোভিত হলঘরখানা এখন যা অস্বাভাবিক রকমের থমথমে! মিতিনমাসির মুখে রা নেই,

রুস্তমজিও নিশ্চুপ। লীলা অবশ্য খানিকটা সামলেছেন, দু'হাত কপালে রেখে তিনিও এখন স্থির। এমন পরিবেশে কি কফিতে চুমুক দেওয়া যায়!

মিতিনই অবশেষে নীরবতা ভাঙল। নরম স্বরে লীলাকে বলল, "আমি এখন আপনাদের কয়েকটা প্রশ্ন করব। মানে, আমার তো এখনও অনেক কিছু জানার আছে...!"

লীলা কপাল থেকে হাত সরালেন। জোরে একবার নাক টেনে সোজা হয়ে বসলেন। চোখের কোলটা মুছে নিয়ে বললেন, "ইয়েস!"

"আপনি যখন গাড়ি নিয়ে স্কুলে পৌঁছোলেন, তখন ঠিক ক'টা বাজে?"

"ঘড়ি তো দেখিনি।" লীলার স্বরে প্রখর অবাঙালি টান, "বিকেল পাঁচটা হবে।"

"তখন স্কুলে দরোয়ান ছাড়া আর কেউ ছিল না?"

"না। রনিদের প্রিন্সিপাল মিসেস রায় নাকি তার পাঁচ মিনিট আগেই বেরিয়ে গিয়েছেন।"

"দরোয়ান কি আপনাকে দেখে অবাক হয়েছিল?"

"ভীষণ। সে তো বারবার হলফ করে বলল, কার্ড দেখে তবে রনিকে ছাড়া হয়েছে। তবে কার্ডটা কে দেখিয়েছে মনে করতে পারল না।"

"দরোয়ানের সঙ্গে কথা বলার পর আর কি আপনি প্রিন্সিপাল-ম্যাডামকে ফোন করেছিলেন?"

"করা উচিত ছিল। তবে... তখন আমি এমন ডিসটার্বড ছিলাম... রুস্তমজিকেও ফোনে পাচ্ছি না... আমার ব্রেন কাজ করছিল না।"

"তক্ষুনি রুস্তমজির অফিসে গেলেন না কেন? রনির স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথেই তো রুস্তমজির অফিস, তাই না?"

"ঠিকই তো! কেন যাইনি? রুস্তমজিকে তো তুলে আনতে পারতাম।" লীলাকে ভারী বিহ্বল দেখাল। একটু ভেবে বললেন, "ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তারক বোধহয় আমায় জিজ্ঞেস করেছিল বাড়ি ফিরব কি না... আমি বোধহয় ঘাড় নেড়েছিলাম। বাড়ি পৌঁছোনোর আগেই অবশ্য রুস্তমজির ফোন এসে গেল।"

"আর-একটা প্রশ্ন। আপনাদের অন্য ড্রাইভারটি তো ছুটিতে। সে কি আগে থেকেই ছুটির কথা বলে রেখেছিল?"

"রাকেশ তো হঠাৎই দেশে গেল। ওর মা নাকি খুব অসুস্থ।"

"ও।" মিতিন আলগা মাথা নাড়ল। অন্যমনস্কভাবে একটা কাজুবাদাম হাতে তুলল। ঘুরে রুস্তমজিকে বলল, "আচ্ছা, আপনার হ্যান্ডসেটে তো দেখলাম ছ'টা বত্রিশে কিডন্যাপারের ফোন এসেছিল?"

রুস্তমজির ঠোঁট নড়ল, "হ্যাঁ, টাইমটা তো তাই।"

"একটা ব্যাপার আমার কিন্তু স্ট্রেঞ্জ লাগছে। আপনার স্ত্রী স্কুলে গিয়েছিলেন পাঁচটা নাগাদ। মৌলালি থেকে আপনার বাড়ি আধঘণ্টার বেশি লাগার কথা নয়। অর্থাৎ মোটামুটি সাড়ে পাঁচটা। আপনিও পৌঁছেছেন তার পর-পরই। বড়জোর পৌনে ছ'টায়। কিডন্যাপারের ফোন আসার অন্তত পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগে। এতক্ষণ টাইম পেয়েও আপনি পুলিশকে জানালেন না...?"

"বিশ্বাস করুন, উপায় ছিল না।" আড়চোখে লীলাকে দেখে নিলেন রুস্তমজি। গলা নামিয়ে বললেন, "লীলা তখন এত এক্সাইটেড ছিল...! ক্রমাগত বলছে, তোমার জন্য রনি মিসিং হল, তোমার জন্য রনির বিপদ ঘটেছে...! ওকে শান্ত করতে গিয়েই...!"

"এক সেকেন্ড। এক সেকেন্ড। ম্যাডাম আপনাকে দোষারোপ করছিলেন কেন?"

"কারণ একটা আছে। যদিও আমি সেটাকে আমল দিতে চাই না।"

"তবু শুনি?"

"লীলার ইচ্ছে ছিল, বাইপাসের দিকে যে গ্লোবাল স্কুলটা হয়েছে, রনি সেখানে পড়ুক। মূলত আমার জেদেই রনি সেন্ট পিটার্সে ভরতি হয়। ওসব এ সি ক্লাসরুম, এ সি স্কুলবাস, চোখ ধাঁধানো পরিমণ্ডল আমার পছন্দ ছিল না।"

লীলা বললেন, "আসল কথাটা বলছ না কেন? তুমি কখনওই ট্র্যাডিশনের বাইরে যেতে চাও না।"

"বটেই তো। আমি সনাতন ধারার স্কুলিংই পছন্দ করি। আমার বিশ্বাস, মিশনারি স্কুলগুলোতেই বেটার চরিত্র গঠন হয়। তা ছাড়া আমি নিজেও সেন্ট পিটার্সের ছাত্র। নিজের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উপর দুর্বলতা থাকবে না?"

"আপনি চমৎকার বাংলা বলেন তো! প্রচুর বাঙালি বন্ধুবান্ধব আছে নিশ্চয়ই?"

"আমি খুব একটা মিশুকে মানুষ নই ম্যাডাম। ক্লাব-পার্টিতেও তেমন যাইটাই না। একমাত্র উইকে এক-দু'দিন আমাদের পারসি ক্লাবে...!" রুস্তমজি একটু থামলেন। ছোট্ট শ্বাস ফেলে বললেন, "কলকাতায় এখন আমরা সাকুল্যে সাতশোজন পারসি বাস করছি। মাত্র শ'আড়াই পরিবার। ওই ক্লাবেই তাদের অনেকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়, নিজেদের সুখদুঃখের গল্প করি...!"

"তা হলে এত ভাল বাংলা শিখলেন কোত্থেকে?"

"আমরা এখানে প্রায় পৌনে দুশো বছর আছি ম্যাডাম। এসেছিলাম সেই আঠেরোশো উনচল্লিশে। যে বছর প্রথম এখানে অগ্নিমন্দির প্রতিষ্ঠা হয়।"

"এজ্‌রা স্ট্রিটে?"

"তার পাশের গলিতে। পারসি চার্চ স্ট্রিটে। মন্দিরটা অবশ্য বহুকালই বন্ধ। ওখানকার পবিত্র আগুন তো এখন রাখা আছে

আমাদের দ্বিতীয় অগ্নিমন্দির আতস আদ্রনে। লালবাজারের কাছে।" রুস্তমজি ফিকে হাসলেন, "প্রায় সাত পুরুষ যেখানে বাস করছি সেখানকার ভাষা তো মাদার টাং-এর মতো সড়গড় হয়ে যাওয়া উচিত, নয় কি? তার উপর আমরা বিজনেসম্যান, লোকাল ল্যাঙ্গোয়েজের উপর দখল না থাকলে ব্যাবসা চালাতেও তো অসুবিধে।"

"তা বটে।" মিতিন মৃদু হাসল, "আচ্ছা, আপনারা ভারতের কোত্থেকে এসেছিলেন? গুজরাত?"

"না, মুম্বই।"

"কার্পেট ইম্পোর্ট-এক্সপোর্টই কি আপনাদের পারিবারিক ব্যাবসা?"

"আগে আরও অনেক কিছু ছিল। জরি দিয়ে শুরু। তারপর জুটমিল, কাপড়ের কল, স্টিমশিপ...। কারখানাগুলো তো অনেক দিনই বন্ধ, তবে কার্গোশিপের বিজনেসটা আছে।"

"আপনিই চালান?"

"না। আমার বাবা শিপিং-এর ব্যাবসাটা ভাইকে দিয়েছেন। সে থাকে মুম্বইয়ে, ওখানেই তার কাজকারবার।"

"আপনার বাবা-মা কি জীবিত?"

"অবশ্যই। তাঁরা এখন ভাইয়ের কাছে। কলকাতাতেও আসেন মাঝে মাঝে। বিশেষ করে নওরোজের টাইমে কলকাতায় থাকাই তাঁদের বেশি পছন্দ।"

"নওরোজ... মানে আপনাদের নিউ ইয়ার?"

"না, না, এটা অন্য উৎসব। প্রাচীনকালে পারস্যে আমাদের সম্রাট জামশেদ যেদিন সিংহাসনে বসেছিলেন, সেই দিনটাকে আমরা নওরোজ হিসেবে পালন করি।"

"উৎসবটা বসন্তকালে হয় না?"

"শীতের শেষে, বসন্তের শুরুতে।" শান্তভাবেই বললেন রুস্তমজি, তবে এবার যেন তাঁকে খানিক অসহিষ্ণু দেখাল। বিনয়ী সুরেই বললেন, "ম্যাডাম, এসব প্রশ্নের সঙ্গে কি রনির কিডন্যাপিং-এর কোনও সম্পর্ক আছে?"

"হয়তো নেই। আবার থাকতেও তো পারে। আসলে আপনাদের পরিবারের সোশ্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু বুঝে নিতে চাইছি।"

"তা হলে একবারেই বলে দিই। আমার পূর্বপুরুষ মুম্বই থেকে প্রথমে এসেছিলেন হুগলিতে। সেখান থেকে কলকাতায় এসেই আবার মুম্বই চলে যান। তারপর আবার কলকাতায় ফিরে চিনদেশের সঙ্গে আফিং-এর ব্যাবসা শুরু করেন। তারপর জাহাজ...। আস্তে আস্তে অন্য বিজনেসেও নেমে পড়েন। আর আমার স্ত্রী লীলার এক পূর্বপুরুষ ছিলেন জামশেদজি ফ্রাম্‌জি ম্যাডান। নিশ্চয়ই তাঁর নাম শুনেছেন?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। অবশ্যই। ওঁকে তো এককালে ইন্ডিয়ান ফিল্মের রাজা বলা হত। ওঁর নামেই তো কলকাতার ম্যাডান স্ট্রিট।"

"এখন অবশ্য লীলার সমস্ত আত্মীয়স্বজনই মুম্বইয়ে সেটল্‌ড। আমারও কলকাতায় আর কোনও নিয়ার রিলেটিভ নেই। আর কিছু জানার আছে কি?"

"আপাতত এই যথেষ্ট।" মিতিন যেন রুস্তমজির মৃদু উষ্মাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না। একই রকম স্বচ্ছন্দ সুরে বলল, "আবার কিডন্যাপিং-এ ফিরি। কোথায়, কখন, কীভাবে টাকা দিতে হবে তা কি কিডন্যাপার জানিয়েছে?"

রুস্তমজি ঈষৎ থতোমতো। তারপর দু'দিকে মাথা নাড়লেন, "না।"

"অর্থাৎ আবার ফোন আসবে।"

"মনে তো হচ্ছে।"

"আপনি কি টাকাটার অ্যারেঞ্জমেন্ট করে ফেলেছেন?"

"হয়ে যাবে।"

"তাড়াহুড়োর দরকার নেই। আবার ফোন আসুক, তারপর এগোবেন।" মিতিন গলা ঝাড়ল, "আচ্ছা, কিডন্যাপারের সঙ্গে যখন কথা হচ্ছিল, কোনও আওয়াজ কানে এসেছে কি? ট্রেনের শব্দ কি বাসের হর্ন, কিংবা দোকানবাজারের হট্টগোল...?"

"বোধহয় একটা সাইকেলরিকশার ভেঁপু..., আমি ঠিক শিয়োর নই।"

"আর দুটো কোয়েশ্চেন। এমন কেউ আছে কি, যে আপনার কাছ থেকে এভাবে বাঁকা পথে টাকা আদায়ের চেষ্টা করতে পারে? কোনও পারিবারিক শত্রু বা বিজনেস এনিমি? অথবা আপনার উপর কোনও ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণে...?"

রুস্তমজির চওড়া কপালে মোটা মোটা ভাঁজ। মিনিটখানেক চিন্তা করে বললেন, "সরি ম্যাডাম। আমি তো তেমন কাউকে খুঁজে পাচ্ছি না।"

"সেকেন্ড কোয়েশ্চেন, রনির অপহরণের সংবাদটা এখনও পর্যন্ত কে কে জানে?"

"র‍্যানসাম চাওয়ার ব্যাপারটা শুধু আপনারাই জানলেন। তবে রনিকে কেউ তুলে নিয়ে গিয়েছে, এটা তো তারক বুঝছে। আমাদের কাজের মেয়ে লছমিও। এ ছাড়া সেন্ট পিটার্সের দরোয়ানও কিছুটা অনুমান করতে পারে। প্লাস, রনিদের প্রিন্সিপালও হয়তো খানিকটা আঁচ পেয়েছেন।" রুস্তমজি লীলার দিকে তাকালেন, "তুমি নিশ্চয়ই কাউকে ফোনটোন করোনি?"

"আমি কাকে ফোন করব?" ঝেঁঝে উঠতে গিয়েও লীলার স্বর করুণ হয়ে গেল সহসা। কাঁদোকাঁদো মুখে মিতিনকে বললেন, "আপনি কিছু একটা করুন ম্যাডাম। যত টাকা চাইবেন, দেব। শুধু আমার বাচ্চা যেন সহি-সলামত ফিরে আসে।"

"ভাবছেন কেন, বাহাত্তর ঘণ্টা সময় তো আমরা পেয়েছি।" মিতিন লীলার হাতে হাত রাখল, "তবে কাজে নামার আগে কয়েকটা জিনিস চাই।"

"কী দেব বলুন?"

"রনির কয়েকটা রিসেন্ট ফোটো। আর স্কুলকে একটা চিঠি, যাতে আমি প্রিন্সিপালের সঙ্গে গিয়ে কথা বলতে পারি। তবে চিঠিতে কিডন্যাপিং-এ খবরটা উল্লেখ করার দরকার নেই।"

"আর?"

"আপনার দুই ড্রাইভারের নাম, ঠিকানা, মোবাইল নাম্বার।"

"আমি দিচ্ছি।" রুস্তমজি শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, "এক্ষুনি।"

"আপনাকে আর-একটা রিকোয়েস্ট ছিল।"

"কী?"

"গাড়িটা অনর্থক বের করার দরকার নেই। আমরা নিজেরাই চলে যাব।"

পলকের জন্য বিস্ময় ফুটে উঠল রুস্তমজির মুখে। একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন মিতিনের দিকে। তারপর ঘাড় দুলিয়ে বললেন, "বেশ, তাই হবে। তবে যদি কিছু পারিশ্রমিক অ্যাডভান্স করি, তাতে নিশ্চয়ই আপনার আপত্তি নেই?"

"তাড়া কীসের মিস্টার জরিওয়ালা? মাত্র তো বাহাত্তর ঘণ্টার মামলা। তার পরেই না হয়...!"

রুস্তমজি আর জোরাজুরি করলেন না। দরকারি জিনিসগুলো একটা বড় খামে পুরে, ছলছল-চোখ লীলাকে ফের আশ্বাসবাণী শুনিয়ে, হ্যানোভার কোর্ট ছাড়ল মিতিন।

ট্যাক্সিতে উঠেই টুপুর বলল, "রুস্তমজির গাড়িটা নিলে না কেন?"

"মিছিমিছি কেন আর ছেলেটাকে খাটাই! এমনিতেই অনেক রাত হয়ে গিয়েছে।"

"অজুহাতটা যেন কেমন-কেমন? তুমি কি তারককে সন্দেহ করছ?"

জবাব নেই। ঠোঁটে কুলুপ এঁটেছে মিতিন। চোখ বুজে হেলান দিল সিটে। টুপুরও যেন অবসন্ন বোধ করছিল। মনটা ভার হয়ে আসছে। লীলার হাউহাউ কান্না এখনও বাজছে কানে। আহা রে, মা বলে কথা। লোকগুলো কী নিষ্ঠুর রে বাবা! রনি তো বুমবুমেরই বয়সি হবে, ওইটুকুনি বাচ্চাকে টাকার লোভে কেউ তুলে নিয়ে যেতে পারে? শুধু কি তাই, মেরে ফেলারও ভয় দেখাচ্ছে। হয়তো কিছু খেতে দেয়নি, হয়তো মারধর করছে...! না, জঘন্য নরপশুগুলোর কড়া শাস্তি হওয়া দরকার।

ভেজা ভেজা গলায় টুপুর ডাকল, "মিতিনমাসি?"

"উঁ?"

"বদমাশদের পাকড়াও করা যাবে তো?"

"দেখি!"

মিতিনমাসির গলায় কি আত্মবিশ্বাসের অভাব? কেসটা অবশ্য বেশ জটিল। কোনও ক্লু-ই তো নেই। ফোন বুথটা খুঁজে পাওয়া গেলেই কি বজ্জাতদের ধরা যাবে? অসম্ভব। বাচ্চার আই-ডি কার্ড পর্যন্ত যারা নকল করতে পারে, তারা নিশ্চয়ই দুঁদে শয়তান। সময়টা বড্ড কম। মাত্র তিন দিন। তাই বোধহয় বেশি দুর্ভাবনায় পড়েছে মিতিনমাসি। রুস্তমজি তো পুলিশকেও জানাচ্ছেন না, পুরোপুরি মিতিনমাসির উপর ভরসা করে বসে, এও তো এক ধরনের মানসিক চাপ। সবচেয়ে বড় ঝঞ্ঝাট, শয়তানদের ধরতে হবে অতি সাবধানে। একবার যদি তারা টের পায় রুস্তমজি গোয়েন্দা লাগিয়েছেন...!

ফাঁকা রাস্তায় শাঁ শাঁ ছুটছে ট্যাক্সি। গড়িয়াহাটের ব্রিজ পেরোল। হঠাৎই নড়েচড়ে উঠল মিতিন। ব্যাগ খুলে মোবাইল বের করল। টকটক বোতাম টিপে ফোন কানে চাপল।

কয়েক সেকেন্ডের প্রতীক্ষা। তারপরই মিতিনের গলা বাজল, "অনিশ্চয়দা? আমি মিতিন বলছি।"

টুপুরের সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল। করছে কী মিতিনমাসি? সরাসরি পুলিশের গোয়েন্দাপ্রধানকে জানিয়ে দিচ্ছে ঘটনাটা?

না, অনিশ্চয় অঙ্কেলের কাছে পাবলিক বুথটার অবস্থান জানতে চাইল মিতিনমাসি। কারণটা ভাঙল না, ঠাট্টা করে এড়িয়ে গেল।

ফোন অফ করে মিতিন বলল, "বাড়ি ফিরে যেন মেসোর সঙ্গে বেশি গল্পে মাতিস না। খেয়েই শুয়ে পড়বি।"

"কেন গো?"

"কাল একটা কঠিন দিন। অনেক ছোটাছুটি আছে।"

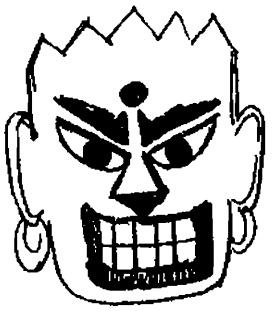

সকালে একটা ভারী প্রাতরাশ, ন'টার মধ্যে স্নান, সাড়ে ন'টা বাজতে না-বাজতে টুপুর পুরোপুরি তৈরি। ব্যাগট্যাগ গুছিয়ে মিতিনও প্রস্তুত। আরতি রান্না করছিল, বেরোনোর আগে তাকে কয়েকটা টুকিটাকি নির্দেশ দিল মিতিন। বুমবুম স্কুল থেকে এলে তাকে কী খেতে দেবে, ম্যাগির বায়না জুড়লেও আরতি যেন কানে না তোলে, খেলতে যাওয়ার আগে বুমবুম যেন অবশ্যই পোশাক বদলায়, এই সব। রাতে টুপুরের প্রিয় কষকষে আলুর দমও বানিয়ে

রাখতে বলল আরতিকে। তারপর ক্যাবিনেটের দেরাজ থেকে বের করল গাড়ির চাবি। হ্যাঁ, আজ গাড়িটা লাগবে।

পার্থ দাড়ি কামাচ্ছিল। কাল রাতে ঘটনাটা শোনার পর থেকে সেও বেশ উদ্বিগ্ন। কোনওরকম মজা, রসিকতা করছে না। বাথরুমের দরজা থেকে মুখ বাড়িয়ে বলল, "বেরোচ্ছ?"

"হ্যাঁ। পারলে আজ একটু তাড়াতাড়ি ফিরো।"

"আমিও কিন্তু তোমাদের সঙ্গে যেতে পারতাম।"

"দরকার কী ভিড় বাড়ানোর! অনর্থক তোমার প্রেসের কাজ ফেলে...!"

"সারাদিন খুব টেনশনে থাকব। কাজে মনই বসবে না।"

"চিন্তা কোরো না। প্রয়োজন বুঝলে তোমায় ডেকে নেব।"

টুপুরকে নিয়ে নীচে এল মিতিন। পার্কিং-স্পেস থেকে লাল মারুতিখানা বের করে চলল অভিযানে। আধঘণ্টাতেই পৌঁছে গেল সেন্ট পিটার্সে। চার্চের লাগোয়া পুরনো বনেদি স্কুল। ইমারতখানা প্রাচীন, তবে চেহারা এখনও বেশ শক্তপোক্ত। উঁচু পাঁচিলের মাঝখানে সবুজ রঙের প্রকাণ্ড লোহার ফটক বন্ধ। কোনও কলরব নেই, অন্দরে ক্লাস চলছে জোর কদমে।

বড় গেটের এক কোণে বেঁটে লোহার দরজা। সেখান দিয়েই ঢুকল মিতিন আর টুপুর। অমনি কোত্থেকে এক খাকি উর্দিধারী বেরিয়ে এল। প্রায় পথ রোধ করে বলল, "কোথায় যাবেন?"

মিতিন ভারিক্কি স্বরে বলল, "প্রিন্সিপাল-ম্যাডামের কাছে। প্রাইমারি সেকশনের।"

"অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?"

রুস্তমজির চিঠিটা হাতে তুলে দেখাল মিতিন। দরোয়ান কী বুঝল কে জানে, বলল, "চলে যান। অফিসের গায়েই ম্যাডামের ঘর।"

ভ্রূ কুঁচকে দরোয়ানটিকে জরিপ করে নিল টুপুর। রোগা, লম্বা,

বছর চল্লিশেক বয়স, ব্যাকব্রাশ করা চুল, মুখটা খানিক চোয়াড়ে-চোয়াড়ে। এই লোকটাই কি রনিকে ছেড়েছিল কাল? আর-একজন দরোয়ানকেও অবশ্য দেখা যাচ্ছে। বিশাল ছাতিমগাছটার তলায় বসে আয়েশ করে খইনি ডলছে মোটাসোটা লোকটা। গাছের ওপাশে চার-চারটে ঢাউস স্কুলবাস দাঁড়িয়ে। না, রুস্তমজির ছেলের স্কুলটি যথেষ্ট ওজনদার।

প্রিন্সিপালের দরজায় পিতলের ফলকে নাম জ্বলজ্বল করছে 'অমিতা রায়'। বাইরে এক বেয়ারা বসে ছিল, তার হাত দিয়ে চিঠিটা পাঠাতেই, কী কাণ্ড, মিসেস রায় স্বয়ং বেরিয়ে এলেন। ধবধবে সাদা বয়কাট চুল, ছোটখাটো চেহারার মহিলাটি মিতিনদের খাতির করে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। আন্তরিক সুরে বললেন, "আপনারা মিস্টার জরিওয়ালার কাছ থেকে আসছেন....,ইউ আর ভেরি মাচ ওয়েলকাম। চা খাবেন? না কফি? নাকি কোল্ড ড্রিঙ্কস?"

"থ্যাঙ্কস। কিচ্ছু না।"

"তা বললে চলে? আপনি জানেন না, মিস্টার জরিওয়ালাকে আমরা কতটা শ্রদ্ধা করি। প্রাক্তনী হিসেবে তিনি সেন্ট পিটার্সের গর্ব। শুধু তাই নয়, আমাদের স্কুলের যে-কোনও অনুষ্ঠানে উনি অকৃপণভাবে সাহায্য করেন।"

"দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, উনি কিন্তু স্কুল থেকে যথোচিত প্রতিদান পাননি।"

মিতিনের কেটে-কেটে উচ্চারণ করা বাক্যটিতে জোর ধাক্কা খেলেন অমিতা। হতভম্ব মুখে বললেন, "কেন, কী হয়েছে?"

"কাল ওঁর ড্রাইভার স্কুলে এসে রনি, আই মিন রৌণককে পায়নি এবং মিসেস জরিওয়ালা উৎকণ্ঠিত হয়ে আপনাকে ফোন করেছিলেন।"

"হ্যাঁ তো। আমি তো খবর নিয়ে ওঁকে জানিয়েও দিলাম মিস্টার জরিওয়ালার অন্য গাড়িটা এসে ওকে নিয়ে গিয়েছে!"

"আপনি শিয়োর, ওঁদের অন্য গাড়িটা এসেছিল?"

"আমাকে তো দরোয়ান সেরকমই বলল...।" অমিতা সহসা থমকালেন, "এনিথিং রং?"

"ভীষণ-ভীষণ রং। রৌণক কাল কিডন্যাপড হয়েছে।"

"অ্যাঁ?" ভদ্রমহিলা প্রায় চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন, পরক্ষণে ধপাস করে বসে পড়লেন। সপ্রতিভতা ঝরে গিয়ে রীতিমতো তোতলাচ্ছেন, "ও মাই গড! পুলিশ জানে?"

"রুস্তমজি এখনও পুলিশকে কিচ্ছু জানাননি। উনি ঘটনাটা স্ট্রিক্টলি কন্‌ফিডেন্সিয়াল রাখতে চান। আশা করি, আপনিও আপাতত খবরটা পাঁচকান করবেন না।"

"নিশ্চয়ই। কিন্তু... আপনি...?"

"প্রাইভেট ডিটেকটিভ।" মিতিন নিজের একটা কার্ড বাড়িয়ে দিল, "কিডন্যাপাররা মুক্তিপণ হিসেবে এক কোটি টাকা চেয়েছে। পরশু সন্ধের মধ্যে। আমি ক্রিমিনালদের ধরার চেষ্টা করছি।"

"ও। তা আমি আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি?"

"ভুলে যাবেন না ম্যাডাম, ঘটনাটা আপনার স্কুলের সামনেই ঘটেছে। আপনাদেরই দরোয়ান রৌণককে কিডন্যাপারদের হাতে তুলে দিয়েছে।"

"দরোয়ান তো আই-ডি কার্ড দেখে তবে...!"

"বুঝলাম। কিন্তু স্কুলের আই-ডি কার্ড বা তার নকল ক্রিমিনালদের হাতে গেল কী করে?"

"সেটা আমি কী করে বলব?" অমিতার গলায় এবার আত্মরক্ষার সুর। চোখ ঘুরিয়ে বললেন, "বাচ্চা জানে কিংবা বাচ্চার গার্জেন।"

"স্কুলে আই-ডি কার্ডের কোনও কপি থাকে না? ক্লাসটিচারের জিম্মায়?"

"না। দুটো কার্ডের একটা বাচ্চার গলায় ঝোলে, অন্যটা থাকে বাড়ির লোকের কাছে।"

"বেশ। কিন্তু প্রতি বছরই নিশ্চয়ই নতুন কার্ড ইসু হয়?"

"হ্যাঁ। পুরনো কার্ডগুলোও গার্জেনদের জিম্মাতেই থাকে। তবে এ বছর...!"

"কী হয়েছে এ বছর?"

"এবার স্কুলের একটা ফাংশান ছিল। অ্যানুয়াল এগ্‌জাম আর সেশনের মাঝে। বাচ্চাদের অনুষ্ঠানে নিয়ে যাওয়ার জন্য পুরনো কার্ডগুলো গার্জেনদের কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলাম। এ বছর নতুন কার্ড ইসু করার পরও ওগুলো আর ফেরত দেওয়া হয়নি।"

"অর্থাৎ আগের বছরের কার্ড আপনাদের হেপাজতে?"

"হ্যাঁ। ক্লাসটিচারদের। আমি অবশ্য ওঁদের বলেছি ডেসট্রয় করে দিতে।"

"কাজটা হয়েছে কি?"

এতক্ষণে অমিতা যেন সামান্য গুটিয়ে গেলেন। দ্বিধান্বিত স্বরে বললেন, "নিশ্চয়ই হয়েছে...!"

"আপনি নিশ্চিত নন, তাই তো?"

অমিতা চুপ। পিরিয়ড শেষের ঘণ্টা পড়ল, বাইরে মৃদু কোলাহল। দু'জন শিক্ষিকা ঢুকছিলেন অমিতার ঘরে, হাতের ইশারায় তাঁদের আসতে মানা করলেন অমিতা। দুই শিক্ষিকাই কিঞ্চিৎ বিস্মিত, তবে চলেও গেলেন তৎক্ষণাৎ।

মিতিন ঘুরে তাঁদের দেখছিল। ফের সিধে হয়ে বলল, "আপনার বক্তব্য তো মোটামুটি শুনলাম। এবার যে রৌণকের ক্লাসটিচারের সঙ্গে একটু কথা বলা দরকার।"

"ডেকে পাঠাব?"

"যদি না খুব অসুবিধে হয়।" মিতিনের স্বর সামান্য নরম, "তবে কাইন্ডলি তাঁর সামনে অপহরণের প্রসঙ্গটা তুলবেন না।"

"সে আমার মাথায় আছে।" বলেই কলিংবেলে চাপ। পলকে বেয়ারা হাজির। অমিতা ভার-ভার গলায় বললেন, "প্রিয়াঙ্কাম্যাডামকে এক্ষুনি আসতে বলো তো। আর শোনো, এখন কাউকে ঘরে অ্যালাও করবে না।"

ঘাড় নেড়ে চলে গেল বেয়ারা। হঠাৎই যেন টুপুরের দিকে নজর পড়ল অমিতার। মুখে আলগা হাসি ফুটিয়ে বললেন, "এটি কে? মিস্টার জরিওয়ালার পরিবারের কেউ?"

"আমার বোনঝি। ঐন্দ্রিলা।"

"যাক, তাও ভাল। আমি ভাবলাম যদি...!" অমিতাকে কেমন অসহায় দেখাল। প্রায় আপন মনে বললেন, "পারসিরা অনেকেই এই স্কুলটা খুব পছন্দ করেন। তাঁরা খবরটা পেলে ছেলেদের হয়তো স্কুল থেকে সরিয়ে নেবেন। স্কুলের পক্ষে সেটা যে কী লজ্জার!"

"স্কুলের মানসম্মানটাই আপনার কাছে বড় হল ম্যাডাম?" মিতিনের স্বর তীক্ষ্ণ, "বাচ্চাটার বিপদ নিয়ে আপনি ভাবিত নন?"

"তা কেন, ছি ছি। রৌণককে আমরা সবাই খুব ভালবাসি। তার উপর সে মিস্টার জরিওয়ালার একমাত্র ছেলে...। এই স্কুল থেকে সে কিডন্যাপ্‌ড হল, ভাবলেই বুকটা ধড়াস-ধড়াস করছে।"

কথার মাঝেই দরজায় এক তরুণী। ছিপছিপে লম্বা, শ্যামলা রং, পরনে সালোয়ার-কামিজ। কাঁধে দোপাট্টা।

অমিতা গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, "প্রিয়াঙ্কা, মিট দিস লেডি। ইনি তোমাকে কিছু প্রশ্ন করবেন। ভেবেচিন্তে ঠান্ডা মাথায় উত্তর দিয়ো।"

প্রিয়াঙ্কা অবাক মুখে বসলেন চেয়ারে। মিতিনকে দেখছেন। টুপুরকেও। সপ্রতিভ স্বরেই মিতিনকে বললেন, "হ্যাঁ, বলুন?"

মিতিন ঈষৎ ঘুরে বসল। প্রায় প্রিয়াঙ্কার মুখোমুখি হয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনি তো ক্লাস ফোরের এ সেকশনের ক্লাসটিচার?"

"হ্যাঁ।"

"বাচ্চাদের স্কুল থেকে ছাড়ার সময় আপনি প্রেজেন্ট থাকেন?"

"এটা তো আমার ডিউটি ম্যাডাম।"

"ঠিক কী পদ্ধতিতে বাচ্চাদের ছাড়েন, একটু যদি বিশদে বলেন।"

"ছুটির পর আমরা সেকশনের বাচ্চাদের লাইনে দাঁড় করাই। যারা স্কুলবাসে যায়, নাম ডেকে-ডেকে তাদের বাসে পাঠিয়ে দিই। আর যাদের বাড়ির লোক নিতে আসে, তাদের গেটের কাছে নিয়ে যাই। বাড়ির লোক আই-ডি কার্ড দেখালে দরোয়ান বাচ্চা হ্যান্ডওভার করে দেয়।"

"আপনি সামনে থাকেন?"

"শেষ বাচ্চাটি যতক্ষণ না যায়, আমাদের দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।"

"কার্ড কে দেখে? আপনি, না দরোয়ান?"

"দু'জনেই। দরোয়ান তো পাশেই থাকে।"

"ভাল করে ভেবেচিন্তে বলুন, প্রতিটি কার্ড আপনি দেখেন তো?"

প্রিয়াঙ্কা সামান্য থতোমতো। ঝলকে প্রিন্সিপালকে দেখে নিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, মানে... সেশনের প্রথম এক-দু' সপ্তাহ খুবই কড়াকড়ি বজায় রাখি। তারপর মোটামুটি চেনাজানা হয়ে গেলে...!"

"কার সঙ্গে চেনাজানা?"

"যাঁরা নিতে আসছেন...। অবশ্য সব সময়ই কার্ড দেখা হয়।"

"গতকাল কি এই নিয়ম পালন করা হয়েছিল?"

প্রিয়াঙ্কা আবার যেন হোঁচট খেলেন। অস্বস্তি মাখা গলায় বললেন, "কেন ম্যাডাম, কোনও কমপ্লেন আছে নাকি?"

"কমপ্লেনের কোনও কারণ ঘটেছিল কি?"

"সেরকম কিছু তো মনে পড়ছে না।"

"একটি বাচ্চাকে কিন্তু কাল বাড়ির ড্রাইভার ছাড়া অন্য একজনের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।"

"এমন তো হওয়ার কথা নয়। তা ছাড়া অচেনা লোকের কাছে ক্লাস ফোরের একটা বাচ্চা যাবেই বা কেন? সে তো আপত্তি জুড়বে।"

"রৌণক জরিওয়ালার বাবা কিন্তু বলছেন, তাঁর গাড়ি এখানে আসার আগেই...!"

"কাল তো রৌণকদের অন্য গাড়িটা এসেছিল। কালো রঙের হন্ডা সিটি। রৌণকের মা যে গাড়িটা নিয়ে আসেন মাঝে মাঝে। ড্রাইভার কার্ড দেখিয়ে নিয়ে গেল, রৌণকও কিছু বলল না...!"

"লোকটা যে ওই গাড়িটিরই ড্রাইভার বুঝলেন কী করে?"

"কারণ, গাড়িটা সে-ই চালাচ্ছিল।"

"আপনি তাকে স্টিয়ারিং-এ দেখেছেন?"

"তা নয়। আসলে ড্রাইভারই তো সাধারণত বাচ্চাদের নিতে আসে। রৌণকও লাফাতে-লাফাতে লোকটার সঙ্গে চলে গেল... তাই অন্য কিছু ভাবার অবকাশ হয়নি।"

"ও। তা কাল হন্ডা সিটিটাই এসেছিল, জানলেন কী করে? গাড়িটা আপনি দেখেছিলেন?"

"সত্যি বলতে কী, ওই সময় অতশত খেয়াল করার সুযোগ কোথায়? এত বাচ্চা...এমন ক্যালোর-ব্যালোর...। তবে কে যেন একটা চেঁচিয়ে বলল...।" প্রিয়াঙ্কা পলকে চিন্তা করলেন, "হ্যাঁ, মনে পড়েছে। সোহম রৌণককে বলছিল, আজ তোদের হন্ডা সিটিটা এসেছে রে।"

"সোহম কি রৌণকের ক্লাসমেট?"

"দু'জনে খুব বন্ধু। পাশাপাশি ছাড়া বসবেই না।"

"হুম। আচ্ছা, শেষ বাচ্চাটাকে যখন কাল ছেড়েছিলেন তখন ক'টা বাজে?"

"সাড়ে তিনটে তো বটেই।" প্রিয়াঙ্কাকে খানিক ব্যাকুল দেখাল, "এত কথা জানতে চাইছেন কেন ম্যাডাম?"

জবাব না দিয়ে প্রিয়াঙ্কার চোখে চোখ রাখল মিতিন, "আপনার সেকশনের বাচ্চাদের গত বছরের কার্ডগুলো তো আপনার হেপাজতেই ছিল?"

"এখনও আছে। আমার ড্রয়ারে।"

"সে কী!" অমিতা প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন," ওগুলো না নষ্ট করে দেওয়ার কথা?"

"হয়ে ওঠেনি ম্যাডাম।" প্রিয়াঙ্কা আমতা-আমতা করছেন, "বাচ্চাদের ফোটো থাকে তো, তাই ছিঁড়তে, পোড়াতে মায়া লাগে। আমরা প্রাইমারির টিচাররা, সবাই মিলে ঠিক করেছি, গরমের ছুটিতে সব পুরনো কার্ড একসঙ্গে জড়ো করে জ্বালিয়ে দেব।"

"বুঝলাম।" মিতিন সহসা গম্ভীর। অমিতার মুখও থমথম করছে। ভুরু কুঁচকে তাঁকে দু'-এক সেকেন্ড দেখে নিয়ে মিতিন বলল, "প্রিয়াঙ্কা, এবার আপনাকে ক'টা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে পারি?"

"বলুন?"'

"আপনি থাকেন কোথায়?"

"টালিগঞ্জ।"

"বাড়িতে কে কে আছেন?"

"মা, দুই ভাই...। বড় ভাই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে, ছোট হায়ার সেকেন্ডারি দিল।"

"বাবা...?"

"বছর দুয়েক আগে মারা গিয়েছেন। রোড অ্যাক্সিডেন্টে।"

"আপনি চাকরি কত দিন করছেন?"

"দেড় বছর।"

"অর্থাৎ বাড়িতে এখন আপনি একাই রোজগেরে?" মিতিনের ঠোঁটে চিলতে হাসি, "সোহম আজ এসেছে?"

"হ্যাঁ।"

"কাইন্ডলি তাকে একটু পাঠিয়ে দেবেন?"

প্রিয়াঙ্কার মুখ শুকিয়ে গেল। কাঁপা-কাঁপা গলায় বললেন, "রৌণকের কী হয়েছে বলুন না, প্লিজ!"

"সময় হলে জানতে পারবেন এবং এখন কলিগদের সঙ্গে নো আলোচনা।" মিতিনের গলা কাঠ-কাঠ, "আর হ্যাঁ, এক্ষুনি ড্রয়ার চেক করে জানান পুরনো সমস্ত কার্ড ঠিকঠাক আছে কি না।"

ঢক করে ঘাড় নাড়লেন প্রিয়াঙ্কা। উঠে বেরিয়ে গেলেন সন্ত্রস্ত পায়ে।

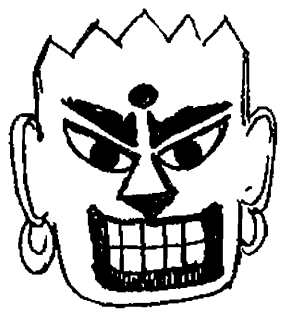

মিলিটারি অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়াল ছেলেটা। হাত, পা, মাথা নড়ছে না এতটুকু। এমনকী, চোখের পলকটাও পড়ছে না। তবে চোখের মণি দুটো ঘুরছে টুপটাপ, ধীর গতিতে টেনিসকোর্টে বল ছোটার মতো। কখনও টুপুরে গিয়ে থামছে, কখনও অমিতায়। দেখছে মিতিনকেও, তবে সেভাবে যেন গুরুত্ব দিচ্ছে না।

মিতিন মিটিমিটি হাসছে। হাসিমুখেই বলল, "তুমি তো মনে হচ্ছে ভারী লক্ষ্মী ছেলে?"

সোহম জবাব দিল না। যেন এরকম একটা ফালতু প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মানেই হয় না।

"তুমি কী খেলতে ভালবাসো? ফুটবল? না ক্রিকেট?"

"ক্রিকেট।"

"ব্যাটিং? না বোলিং?"

এবার ঘাড় একটু ঘুরল, "আমি পেস বল করি।"

"ও মা, তাই নাকি? কে তোমার ফেভারিট বোলার?"

"ব্রেট্ লি।"

"কোনও ব্যাটসম্যানকে তোমার ভাল লাগে না?"

"লাগে। ম্যাথু হেডেন।"

"সে কী! ভারতের কোনও খেলোয়াড়কে পছন্দ নয়? সচিন তেন্ডুলকর?"

"সর্বদাই সচিন ভাল, তবে আমি অস্ট্রেলিয়ার সাপোর্টার।"

"বাঃ, বাঃ।" মিতিন জোরে হেসে উঠল, "ভারতীয় হলে ভারতের ক্রিকেটটিমকে সাপোর্ট করতে হবে, এমন তো কোনও রুল নেই!"

সোহমের ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটল এতক্ষণে। কৌতূহলী স্বরে বলল, "তুমিও অস্ট্রেলিয়ার দলে?"

"একটু একটু।"

মিতিন এলোমেলো গল্প করেই চলেছে। টুপুর অবাক হয়ে দেখছিল, কীভাবে সোহমের আড়ষ্টতা কাটিয়ে দিচ্ছে মিতিনমাসি। মিনিট দু'-তিন পর মূল প্রসঙ্গে এল। সোহমকে কাছে টেনে বলল, "রৌণক তোমার খুব বন্ধু, তাই না?"

"ফার্স্ট ফ্রেন্ড।" বলেই সোহমের চোখ পিটপিট, "তুমি রৌণককে চেনো?"

"চিনি তো। রৌণকের বাবা আমার বন্ধু।"

"ও। রৌণক আজ আসেনি কেন?"

"শরীরটা ভাল নেই।"

"কী হয়েছে রৌণকের?"

"সিরিয়াস কিছু নয়। কাল-পরশুর মধ্যে সেরে যাবে।"

"কাল তো রৌণক ভালই ছিল! যাওয়ার সময় বলল, আজ আমার জন্য ভিডিয়ো গেমসের নতুন একটা সিডি আনবে...!"

"কাল বুঝি রৌণকদের গাড়ি আগে এসেছিল?"

"হ্যাঁ। ও যে হন্ডা সিটিটায় গেল...!"

"যে হন্ডা সিটি মানে? ওটা তো রৌণকদেরই আর-একটা গাড়ি!"

"উঁহু। ওটা রৌণকদের সেই গাড়িটা নয়।"

"বলো কী, অ্যাঁ?"

অমিতা চুপচাপ কথোপকথন শুনছিলেন, এবার প্রায় আঁতকে উঠলেন, "প্রিয়াঙ্কাম্যাডাম এইমাত্র বলে গেলেন, কাল তুমি নাকি চেঁচাচ্ছিলে, 'রৌণক, তোদের হন্ডা সিটিটা এসেছে।' "

"আমার মিসটেক হয়েছিল ম্যাম। রংটা সেম তো, তাই...!"

"কী করে বুঝলে ওটা অন্য গাড়ি?" মিতিনও বেশ উত্তেজিত, "নম্বর দেখে?"

"হ্যাঁ তো। রৌণকদের হন্ডা সিটির নাম্বার থ্রি থ্রি ফোর ফোর। কালকের গাড়ির নাম্বারে কোনও থ্রি ছিলই না। ফোরও না।"

"তাও রৌণক ভুল গাড়িতে উঠে গেল?"

"তাই তো দেখলাম। যে আঙ্কলটা নিতে এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে লাফাতে-লাফাতে...!"

"আঙ্কলটাকে তুমি চেনো?"

"উঁহু। কখনও দেখিনি।"

"তার মানে যে আঙ্কল হন্ডা সিটি চালান, ওই আঙ্কলটা তিনি নন?"

"কী জানি! আমি তো সেই ড্রাইভার আঙ্কলকে ভাল করে দেখিইনি।"

"কেন? হন্ডা সিটি তো মাঝেসাঝে রৌণককে নিতে আসে?"

"হন্ডা সিটি যেদিন আসে, আন্টি নিজেই নেমে রৌণককে নিয়ে যান। ড্রাইভার আঙ্কল গাড়িতেই থাকেন। তা ছাড়া অনেক সময় তো আন্টি নিজেই গাড়ি চালান।"

"বুঝলাম।" মিতিন সামান্য ঝুঁকল, "আচ্ছা সোহম, কালকের আঙ্কলটা কি ইউনিফর্ম পরা ছিলেন?"

"না। গ্রিন শার্ট। আর জিন্‌স।"

"দেখতে কেমন?"

"গোঁফ আছে, চশমা আছে, হাইট শর্ট...!" বলতে-বলতে থমকাল সোহম। চোখ সরু করে বলল, "এত কোয়েশ্চেন করছ কেন? রৌণক কি মিসিং?"

"না না, তোমার মেমারি টেস্ট করছিলাম।" মিতিন আলগা হাসল, "এবার বলো তো, যে গাড়িটা এসেছিল, তার নাম্বার কত?"

"পুরোটা পড়তে পারিনি। তার আগেই তো হুস করে বেরিয়ে গেল। তবে নাম্বারটায় সিক্স আর নাইন ছিল। পাশাপাশি। লাস্টে।"

"দারুণ চোখ তো তোমার! তা গাড়িতে রৌণক আর ওই আঙ্কল ছাড়া আর কি কেউ ছিল?"

"দেখতে পেলাম কোথায়! রৌণকও উঠল, গাড়িও ধাঁ।"

"যাঃ, এই আনসারটা তা হলে তুমি দিতে পারলে না!" মিতিন আবার একটু হাসল, "যাক গে, তুমি মেমারি টেস্টে পাশ করে গিয়েছ। আজই রৌণককে গিয়ে বলছি, তোমার জন্য সিডি যেন অবশ্যই নিয়ে আসে।"

"থ্যাঙ্ক ইউ।"

"তুমি কিন্তু এখন রৌণককে ফোন কোরো না। শুয়ে থাকতে হচ্ছে তো, বন্ধুদের ফোন পেলে মন খারাপ হবে। যাও, ক্লাসে যাও।"

দু'পা গিয়েও সোহম দাঁড়িয়ে পড়ল। সন্দিগ্ধ চোখে মিতিনকে বলল, "তুমি কি পুলিশ?"

"কেন বলো তো?"

"এত ক্রস করলে! নিশ্চয়ই রৌণকের অন্য কিছু একটা হয়েছে!"

"এ মা, তুমি কী বোকা! পুলিশ কি এরকম একটা দিদিকে সঙ্গে নিয়ে ঘোরে?" টুপুরকে দেখাল মিতিন। হাসি-হাসি মুখেই বলল, "আমি রৌণকের একটা আন্টি। রৌণক ক'দিন স্কুলে আসবে না তো, খবরটা তাই প্রিন্সিপালম্যামকে দিতে এসেছিলাম।"

সোহম তবু যেন বিশ্বাস করল না। তবে চলে গেল পায়ে-পায়ে। মিতিন আর টুপুরকে দেখতে-দেখতে।

ছেলেটা ঘর থেকে বেরনোমাত্র অমিতা কপাল চাপড়ালেন, "কী হবে এখন? রৌণককে কীভাবে উদ্ধার করা যাবে?"

মিতিন নীরব। মুখে একটি শব্দও নেই। একটুক্ষণ গুম হয়ে বসে টুপুরকে চেয়ার ছাড়ার ইঙ্গিত করল। কোনও বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়েই বেরিয়ে পড়ল অমিতার ঘর থেকে।

স্কুল কম্পাউন্ডের বাইরে ফুটপাথ ঘেঁষে মিতিনের মারুতি। সেদিকে এগোতে গিয়েও টুপুরের পা সহসা নিশ্চল। উত্তেজিত মুখে বলল, "প্রিয়াঙ্কাম্যাডামের কাছ থেকে আই-ডি কার্ডের খবরটা তো নেওয়া হল না!"

ব্যাগ থেকে গাড়ির চাবি বের করছিল মিতিন। ভাবলেশহীন গলায় বলল, "প্রয়োজন নেই।"

"কেন?"

"পুরনো কার্ড যদি নকল হয়ে থাকে, আর সেই কাজে যদি স্কুলের কেউ জড়িত হয়...!"

"তা হলে সেই কার্ড এখন ফেরতও চলে এসেছে।"

"তবু জেনে নিলে...!"

"নষ্ট করার মতো সময় হাতে নেই টুপুর।"

"কিন্তু..., যে দরোয়ান কাল রনিকে ছেড়েছিল, তাকে তো একবার ট্যাপ করতে পারতে?"

"দরকার পড়লে নিশ্চয়ই করব। তবে আগের কাজ আগে।" মিতিন গাড়ির স্টিয়ারিং-এ বসল। গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার আগে মোবাইল বের করল। বোতাম টিপে চাপল কানে।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে ওপার থেকে পার্থর গলা ঠিকরে এল, "কী নিউজ? কী হল স্কুলে? জানা গেল কিছু?"

"পরে শুনো। এক্ষুনি একটা কাজ করে দিতে হবে তোমাকে। মোটর ভেহিক্‌ল ডিপার্টমেন্টে তোমার এক বন্ধু আছে না?"

"শ্যামল বসাক। ডেপুটি ডিরেক্টর।"

"চটপট তার সঙ্গে যোগাযোগ করো। একটা গাড়ির ডিটেল ইনফরমেশন চাই। কালো হন্ডা সিটি। শেষ দুটো নাম্বার ছয় আর নয়। কবে রেজিস্ট্রেশন হয়েছে, মালিকের নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার, সব জোগাড় করে ফেলো। যদি কলকাতায় রেজিস্ট্রেশন না হয়ে থাকে, সেটাও জানাও। কতক্ষণ লাগবে?"

"ধরে নাও অন্তত ঘণ্টাদুয়েক।"

"চেষ্টা করো যাতে এক ঘণ্টার মধ্যে হয়। বলো, এক্সট্রিম্‌লি আর্জেন্ট। একটা বাচ্চার জীবন-মরণের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে।"

"দেখছি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব...!"

ব্যস, কথার মাঝখানেই মোবাইল অফ। মিতিনের দৃষ্টি উইন্ডস্ক্রিনে স্থির।

টুপুরের উত্তেজনার পারা আরও চড়ছিল। উৎসাহিত চোখে বলল, "সোহম কিন্তু জব্বর একটা ক্লু দিয়েছে।"

"হুম। সূত্রটা ইম্পর্ট্যান্ট। এগোতে সুবিধে হবে।"

"শুধু সুবিধে? গাড়ির মালিকের সন্ধান পেলেই তো কালপ্রিট কট।"

"অত সহজ বোধহয় নয় রে। অপরাধী অনেক ভাবনাচিন্তা করেই এগিয়েছে। হিসেব ছকে।"

"কী হিসেব?"

"তলিয়ে ভাব।" মিতিনের মারুতি চলতে শুরু করল। মৌলালি মোড়ের আগে ঘুরল বাঁয়ে, এসপ্ল্যানেড অভিমুখে। হালকা যানজট ঠেলে এগোচ্ছে। গিয়ার বদলাতে-বদলাতে মিতিন বলল, "হাতে তো এখন খানিকটা সময় আছে, লাইট লাঞ্চ সেরে নিবি নাকি?"

"যা বলবে।"

মিনিট দশ-পনেরোর মধ্যে গাড়ি মধ্য কলকাতার এক স্ন্যাকবারের দরজায়। সবে বারোটা বাজে, দোকানে এখন তেমন ভিড় নেই। সকালের পরোটা-আলুচচ্চড়িতে পেট এখনও গজগজ, মাসি-বোনঝি কারওই তেমন খিদে পায়নি, তবু একপ্লেট করে স্যান্ডুইচের অর্ডার দেওয়া হল। সঙ্গে কফি।

মনে মনে ঘটনা পরম্পরা সাজানোর চেষ্টা করছিল টুপুর। স্যান্ডুইচ হাতে তুলে বলল, "একটা ব্যাপার কিন্তু দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। কোনও পেশাদার অপরাধী রনিকে অপহরণ করেনি। যে করেছে, সে রনির যথেষ্ট পরিচিত।"

"বটেই তো। নইলে রনি নির্বিবাদে তার সঙ্গে যাবে কেন!"

"ইস, রনি যদি একবার গাড়ির নাম্বারটা খেয়াল করত!"

"বড়রাই করেন না, ও তো একটা বাচ্চা। আমাদের বাড়ির তলায় যদি একটা লাল মারুতি দাঁড়িয়ে থাকে, তুই কি প্রথমে ধরে নিবি না গাড়িটা মিতিনমাসির? নাম্বার মেলানোর কথা কি আগে মাথায় আসবে?"

"তা ঠিক। কিন্তু প্রশ্ন হল, সেই চেনা লোকটি রনির আই-ডি

কার্ড পেল কোত্থেকে? স্কুলের কারও সঙ্গে যোগসাজশ করেই কি পুরনো কার্ডটা...!"

"কার্ড জোগাড় করার আরও নানান উপায় আছে রে। যাক গে, তোর যা মনে হচ্ছে বলে যা, শুনছি।"

"আমার ধারণা...।" টুপুর ঢোক গিলল, "দুষ্কর্মের প্ল্যানটা ছকা হয়েছে অনেক আগে। যখন পুরনো কার্ডগুলো ক্লাসটিচারের জিম্মায় এসেছে, তখনই...!"

"তার মানে বলছিস প্রিয়াঙ্কাও এর সঙ্গে জড়িত?"

"সরাসরি যোগ না থাকলেও, কিছু দায় তো তাঁর আছেই। প্রথমত, কার্ডগুলো তিনি নষ্ট করেননি। দ্বিতীয়ত, নিশ্চয়ই তিনি কার্ডগুলোকে যথেষ্ট সাবধানে রাখেননি। আর সেই সুযোগ নিয়েই কেউ... হয়তো ওই দরোয়ানটাই রনির পরিচিত লোকের কাছে কার্ডটা পাচার করেছিল। যেহেতু সে অপরাধের অংশীদার, তাই হয়তো ছুটির সময় ইচ্ছে করে কার্ডটা ভাল করে চেক করেনি। প্রিয়াঙ্কাম্যাডাম তো কিছুই দেখেন না, অতএব লোকটাকে সন্দেহের মুখে পড়তেও হয়নি।" টুপুর আশান্বিত চোখে তাকাল, "কী গো, ভুল বললাম?"

"না। সেভাবে দেখতে গেলে তো প্রিয়াঙ্কা স্বয়ং জড়িয়ে থাকতে পারেন। গোটা সংসারের দায় তাঁর কাঁধে, পরিবার চালাতে তাঁর খরচ-খরচাও কম নয়...! প্রলোভনে উনি পড়তেই পারেন।"

"তবে?" টুপুর আরও উৎসাহিত, "প্রশ্ন এখন একটাই। নাটের গুরুটি কে? আমার তো মনে হয় রাকেশ। মানে মিস্টার জরিওয়ালার হন্ডা সিটির ড্রাইভার।"

"সে বেচারাকে সন্দেহ করার কারণ?"

"তার ছুটি নেওয়া এবং রনি-অপহরণ একই সঙ্গে ঘটল, এটা কি কাকতালীয়? দুটো ঘটনার মধ্যে কোনও সম্পর্ক নেই? যেমন

পুরনো কার্ড এ বছর ক্লাসটিচারের হেপাজতে থাকা আর রনিকে গুম করা, দুটো ঘটনা একই সময়ে ঘটা মোটেও আকস্মিক হতে পারে না।"

"উম, তোর মগজ তো দেখছি পাকছে! বেশ পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে ভাবতে শিখেছিস!" মিতিন মুচকি হাসল, "আর-একটা ঘটনাও কিন্তু ঘটেছে রে। সেটাও কাকতালীয় না হতে পারে।"

"কী বলো তো?"

"প্রিয়াঙ্কার স্টেটমেন্ট পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মনে করার চেষ্টা কর।"

টুপুরের পুরো গুলিয়ে গেল। স্টেটমেন্টের কোন অংশটার কথা বলছে মিতিনমাসি? উপযাচক হয়ে হন্ডা সিটির খবর শোনানোটা, নাকি...?

ভাবনার মাঝেই মিতিনমাসির মোবাইল বাজল। মনিটরে নাম দেখে তাড়াতাড়ি ফোন কানে ধরল মিতিনমাসি, "হ্যাঁ অনিশ্চয়দা, বলুন? ও, ফোনবুথটা লেক টাউনে? বাঙ্গুর অ্যাভেনিউ? হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝেছি। থ্যাঙ্ক ইউ দাদা। পরে বলব। সম্ভবত পরশু আপনার সাহায্য লাগবে। সময় আর জায়গা আপনাকে জানিয়ে দেব।"

চলভাষযন্ত্র নীরব হওয়ার পর টুপুর কলকল করে উঠল, "রনিকে তা হলে লেক টাউনে রেখেছে?"

"উঁহু। ফোনটা ওখান থেকে এসেছিল। এবং এর থেকে কিছুই প্রমাণ হয় না।" মিতিন ব্যাগের চেন টানল। মাথা নেড়ে বলল, "তবে একবার তো যেতে হবেই। যদি বুনো হাঁসের পিছনে তাড়া হয়, তবুও।"

বিল মিটিয়ে ফের লাল মারুতি। ফের ছুটল গাড়ি। মূল শহর ছেড়ে বাইপাস পৌঁছোতে প্রায় চল্লিশ মিনিট লেগে গেল। এত জ্যাম রাস্তায়!

উলটোডাঙার মুখে এসে আবার মিতিনের মোবাইল ঝনঝন।

গাড়ি চালানোর সময় ফোন ধরে না মিতিন, মাসির ব্যাগ খুলে টুপুরই বোতাম টিপল। ও প্রান্তে মিসেস জরিওয়ালা। গলা থরথর কাঁপছে, "ম্যাডাম, সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে!"

নিজের পরিচয় দিতে ভুলে গেল টুপুর। উৎকণ্ঠিত স্বরে বলল, "নতুন কী ঘটল আবার?"

"এইমাত্র একটা ফোন এসেছিল। আই মিন, রনির কিডন্যাপারের।"

"কী বলছে?"

"রুস্তমজি যে আপনাকে অ্যাপয়েন্ট করেছে, সেটা ওরা জেনে গিয়েছে।"

"তো?"

"খুব শাসাচ্ছিল। কেউ কোনওরকম গোয়েন্দাগিরি চালালে রনিকে ওরা মেরে দেবে।"

"তা আমরা এখন কী করব?"

"আমি রুস্তমজিকে বলছি আপনাদের রুপিয়া দিয়ে দিতে। আপনারা আর কিচ্ছু করবেন না, প্লিজ! অনুগ্রহ করে আমার রনিকে নির্বিঘ্নে ফেরত পেতে দিন।"

টুঁ শব্দটি না করে লীলার বক্তব্য শুনল মিতিন। চোয়াল শক্ত হল ক্রমশ। জ্বলছে চোখ জোড়া। তবে গাড়ি কিন্তু চালাচ্ছে একই গতিতে। এতটুকু ছন্দপতন নেই।

টুপুর নিচু গলায় ডাকল, "মিতিনমাসি?"

"উঁ?"

"ফোনবুথ-টুথে গিয়ে আর লাভ আছে কোনও?"

"লাভ-লোকসানের হিসেব কষা গোয়েন্দার কাজ নয়। কেস যখন নিয়েছি, শেষ না দেখে ছাড়ব না।"

"বাচ্চাটার যদি কোনও ক্ষতি হয়ে যায়?"

"হবে না।"

"কী করে জোর দিয়ে বলছ?"

"যারা ভয় দেখায়, তাদের কলজের জোশ কম। জানবি, তারা নিজেরাই ভয় পেয়েছে।"

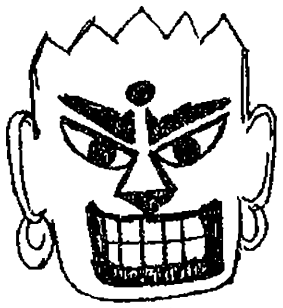

সবে ফাল্গুন মাস চলছে। তবে দুপুরের রোদ এখনই যথেষ্ট কড়া। বেলা আড়াইটে বাজে, বাঙ্গুর অ্যাভেনিউয়ের পথঘাটে লোক নেই বিশেষ। মিতিনদের অবশ্য কপাল ভাল, খুব একটা খোঁজাখুঁজি করতে হল না, সহজেই সন্ধান মিলল ফোনবুথখানার।

বড় রাস্তার উপরেই খুপরি দোকান। বাইরে জ্বলজ্বল করছে সাইনবোর্ড। দোকানের অর্ধেকটা কাচ দিয়ে ঘেরা টেলিফোন-ঘর, বাকি জায়গাটুকুতে চেয়ার-টেবিল নিয়ে বসে এক প্রৌঢ় মানুষ। টেবিলে খাতাপত্র আর বিলিং মেশিন।

গাড়ি থেকে নেমে সটান দোকানে ঢুকল মিতিন। ফাঁকা বুথে একা-একা ঢুলছিলেন ভদ্রলোক। ভরদুপুরে মিতিনদের আগমনে ধড়মড়িয়ে উঠলেন। চোখ কচলে বললেন, "লোকাল কল করবেন? না এস টি ডি?"

"কোনওটাই নয়।" মিতিন নিজের কার্ড বাড়িয়ে দিল, "একটা ইনফরমেশন চাই।"

ভদ্রলোক কার্ড উলটেপালটে দেখলেন বটে, তবে যেন ঠিকঠাক বুঝতে পারলেন না। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন।

মিতিন ভারিক্কি গলায় জিজ্ঞেস করল, "বুথে কি আপনিই থাকেন সারাদিন?"

"কেন বলুন তো?"

"আমার জানা দরকার, কাল বিকেল-সন্ধেয় এখানে কে ছিল?"

"আমিই তো থাকি। কালও নিশ্চয়ই আমিই ছিলাম।"

"ভালভাবে মনে করে দেখুন তো, কাল বিকেল সাড়ে ছ'টা নাগাদ কে বা কারা এখানে ফোন করতে এসেছিল!"

"অত খেয়াল থাকে নাকি? কত লোক ঢুকছে, বেরোচ্ছে...! আর বিকেল-সন্ধেতে তো ভাল ভিড় থাকে।"

"এখান থেকে কোথায় ফোন যাচ্ছে না যাচ্ছে, তার রেকর্ড থাকে নিশ্চয়ই?"

"বিলে নাম্বার থাকে। আমি ওসব রেকর্ড রাখি না। অযথা কাগজের জঞ্জাল কে বাড়ায়?"

"কিন্তু কাল এখান থেকে এমন একটা কল হয়েছে, যার জন্য আপনি ঝামেলায় পড়তে পারেন।"

"কেন? কী হয়েছে?" ভদ্রলোক এতক্ষণে যেন সন্ত্রস্ত, "কে ফোন করেছে এখান থেকে?"

"ভয়ংকর এক অপরাধীর গ্যাং।" মিতিন গলাটাকে বেশ রহস্যময় করল, "পুলিশ কিন্তু আপনাকে এসে ধরবেই।"

"এ কী ফ্যাসাদ রে বাবা! ভদ্রলোকের মুখ-চোখ শুকিয়ে গেল, "ব্যাপারটা কী, খুলে বলবেন তো!"

"এক্ষুনি জানানো যাবে না। শুধু এটুকু বলতে পারি, এসেছিল দু'জন। তারা একসঙ্গে বুথে ঢুকেছিল। ঠিক সাড়ে ছ'টায়।" মিতিনের চোখ সরু, "কিছু স্মরণে আসছে কি?"

"দাঁড়ান, দাঁড়ান।" ভদ্রলোক চোখ বুজে ভাবলেন একটু। তারপর ঘাড় নাড়তে-নাড়তে বললেন, "সময়টা আমি অত দেখিনি, তবে সন্ধের মুখে-মুখে... সাইকেল নিয়ে... দুটো কল করল দু'জনে...!"

"দু'জনই ছিল তো?"

"হ্যাঁ। ওই মোড়ের বাড়ির ভদ্রমহিলা তখন বুথে। আই এস ডি করছিলেন। লোক দুটো এখানেই দাঁড়িয়ে ছিল, এই টেবিলের সামনে। একজনের কাঁধে কিট্‌সব্যাগ ছিল। ঘড়ি দেখছিল ঘনঘন। আমাকে দু'-একবার তাড়াও লাগাল।"

"কীরকম বয়স তাদের?"

"নিখুঁতভাবে বলি কী করে? তবে ধরুন গিয়ে... পঁয়ত্রিশ-চল্লিশটল্লিশ...!"

"কেমন দেখতে?"

"অর্ডিনারি। চেহারায় তো সন্দেহ করার মতো কিছু দেখিনি।"

"পোশাক কী ছিল বলতে পারবেন?"

"না ম্যাডাম। অত আমি লক্ষ করি না। তবে খুব একটা উৎকট পোশাক ছিল না, এটুকু জানাতে পারি। তেমন হলে তো চোখে লাগত।"

"হুম। ফোন শেষ হওয়ার পর তারা কী করেছিল?"

"বিল পেমেন্ট করল। তারপর সাইকেল ফুটপাথে দাঁড় করানো ছিল, চড়ে চলে গেল।"

"দু'জনের দুটো সাইকেল?"

"হ্যাঁ। না, না, সাইকেল বোধহয় একটাই ছিল।"

টুপুর আর চুপ থাকতে পারল না। ভুরু কুঁচকে বলল, "তার মানে একটা সাইকেলেই দু'জনে...?"

"তাই হবে। কে জানে, আমি হয়তো ভুলও বলতে পারি।"

"যেটুকু স্মরণ করতে পারলেন, সেটুকুই যথেষ্ট।" মিতিন চিলতে হাসল, "আপনাকে একটি অনুরোধ আছে।"

"বলুন?"

"আমার কার্ডটা ড্রয়ারে রেখে দিন। যদি লোক দুটো আবার

আসে বা পথেঘাটে তাদের দেখে চিনতে পারেন, সঙ্গে-সঙ্গে আমাকে খবর দেবেন।”

“অবশ্যই।” ভদ্রলোক জোরে-জোরে মাথা নাড়লেন। তারপর হঠাৎই দৃষ্টি সরু, “লোক দুটো কি কাউকে খুনটুন করেছে ম্যাডাম?”

“ওই গোছেরই কিছু। এখন বলা বারণ।”

ভদ্রলোককে আর কোনও প্রশ্নের অবকাশ না দিয়ে মিতিন সোজা দোকানের বাইরে। গাড়ি স্টার্ট করে টুপুরকে বলল, “তোর মেসোকে একটা ফোন লাগা তো। দ্যাখ তো, কদ্দূর এগিয়েছে!”

মাসির ব্যাগ খুলে মোবাইলটা বের করতে-করতে টুপুর বলল, “এখান থেকে কিন্তু খানিকটা দিশা পাওয়া গেল।”

“যেমন?”

“সাইকেলে যখন এসেছিল, লোক দুটো নির্ঘাত কাছাকাছি কোথাও থাকে।”

“অসম্ভব নয়।”

“অতএব রনিকেও ধারেকাছে কোথাও রেখেছে।”

“হুম। নে, এবার ফোনটা লাগা।”

মেসোর নাম্বার টেপার আগেই মোবাইলে বাজনা। স্বয়ং রুস্তমজির কল।

চমকে গিয়ে মিতিনমাসিকে ফোনটা বাড়িয়ে দিতে যাচ্ছিল টুপুর, মিতিনের ইশারায় নিজের কানেই চাপল, “মাসি এখন ড্রাইভ করছেন মিস্টার জরিওয়ালা। কিছু খবর থাকলে আমায় দিতে পারেন।”

তিন-চার সেকেন্ড পর রুস্তমজির গলা শোনা গেল, “ওয়েল, লীলা একটু আগে আমায় ফোন করেছিল। ওকে কিডন্যাপাররা খুব ভয় দেখিয়েছে।”

"জানি। ম্যাডাম মাসিকে বলেছেন।"

"ইয়েস, আমি সেটাও শুনেছি।"

"ও।"

"আমার এখন জানার বিষয়, আপনার... আই মিন তোমার মাসি এখন কী করতে চান? আর এগোবেন? না তদন্তটা এখানেই স্টপ করে দেবেন?"

আড়চোখে মিতিনমাসিকে দেখে নিয়ে টুপুর বলল, "কোনও ইনভেস্টিগেশন শুরু করে মাঝপথে থেমে যাওয়াটা মাসির স্বভাবে নেই, মিস্টার জরিওয়ালা।"

"এটা খুবই প্রশংসনীয়। আমি এই অ্যাটিটিউডটাই বেশি পছন্দ করি। তবে উনি যদি এখানেই থেমে যেতে চান, তা হলেও আমার আপত্তি নেই। আমি ওঁকে যথাযথ ফিজ দিয়ে দেব। লীলার উপর দিয়ে যে মানসিক ঝড়টা যাচ্ছে, তার কথাও তো মাথায় রাখতে হবে।"

"তা ঠিক। তবু...!" টুপুর মুহূর্তের জন্য থামল। গলা ঝেড়ে নিয়ে বলল, "কাজ না করে ফিজ নেওয়াটাও আমার মাসির ধাতে নেই, মিস্টার জরিওয়ালা। তা ছাড়া মাসি এই কেসটায় বেশ খানিকটা এগিয়েছেন, এখন কিডন্যাপারদের না ধরে আগেই থেমে যাওয়াটা তাঁর পক্ষে অত্যন্ত অসম্মানজনক।"

ও প্রান্তের স্বর একটুক্ষণ নীরব। তারপর আবার বাজল, "ঠিক আছে, ম্যাডাম যা ভাল বুঝবেন তাই করুন। আমিও তো অপরাধীদের শাস্তি চাই। বাই দ্য বাই, উনি কদ্দূর কী এগোলেন, জানতে পারি কি?"

এতক্ষণের সমাচার উগরে দিতে যাচ্ছিল টুপুর, হঠাৎ কাঁধে মিতিনের মৃদু চাপ। ইঙ্গিত বুঝে থমকাল টুপুর। আমতা-আমতা করে বলল, "মাসি আপনাকে সব জানাবে।"

"ওকে। নো প্রবলেম। ম্যাডামের ফোনের অপেক্ষায় রইলাম।"

ফোনটা ছাড়তেই মিতিন হালকা গলায় বলল, "তোকে তো দেখছি এবার রেমিউনারেশন দিতে হবে রে।"

"কেন গো?"

"যা ওস্তাদ হয়ে উঠছিস দিনদিন! কী সুন্দর গুছিয়ে কথা বললি রুস্তমজির সঙ্গে।"

মিতিনমাসির মুখে এমন তারিফ শুনলে টুপুরের পুলক না জেগে পারে! একগাল হেসে বলল, "মানছ তা হলে আমি তোমার যোগ্য সহকারী?"

"অনেকটা। তবে আরও দু'-চারটে কথা রুস্তমজিকে বলা উচিত ছিল।"

"কীরকম।"

"কিডন্যাপারদের ফোন আবার আসবে। রুস্তমজি যেন প্রতিটি কলের নাম্বার আর টাইম নোট করেন এবং অবিলম্বে আমাকে জানিয়ে দেন।"

"ঠিকই তো! এটা তো মাথায় আসেনি!" টুপুর ঝটিতি মোবাইলটা হাতে নিল, "বলে দিই রুস্তমজিকে?"

"হুটোপুটির দরকার নেই। ফোন এলে উনি নিজেই করবেন।"

"তা হলে আমাকে দোষ দিচ্ছ কেন?"

"যেটা বলা উচিত ছিল, সেটা তোকে শেখাচ্ছি।" লেক টাউন ছেড়ে ভি আই পি রোডে পড়ল গাড়ি। বাঁয়ে গাছপাল্লা আর সরু খালের ওপারে সল্টলেকের বাড়িঘর। একটা ফুটব্রিজও গিয়েছে সেদিকপানে। আলগাভাবে ফুটব্রিজটাকে দেখে নিয়ে মিতিন বলল, "তুই কিন্তু দরকারি ফোনটার কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিস টুপুর।"

এ তো রীতিমতো কর্তব্যে গাফিলতি। টুপুর জিভ কাটল। পার্থমেসোর লাইনটা টিপে মাইক্রোফোনটাও চালু করে দিল।

"কী গো মেসো, সাড়াশব্দ নেই কেন?"

"আর বলিস না। শ্যামলকে তো ফোনে ধরতেই পারছিলাম না। এনগেজ্‌ড, এনগেজ্‌ড...।"

"তা হলে?"

"পেয়েছি শেষ পর্যন্ত। শ্যামল একটু টাইম চাইল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ডিটেল পেয়ে যাব। তোরা কোথায়?"

এবার টুপুর নয়, মিতিনের জবাব। গলা তুলে বলল, "আমরা তোমার প্রেসে যাচ্ছি। ট্রাফিক নরমাল থাকলে মিনিট কুড়ির মধ্যে পৌঁছে যাব।"

লাগল অবশ্য প্রায় এক ঘণ্টা। দুপুরবেলা প্যাসেঞ্জার তোলার জন্যে বাস-মিনিবাসগুলো যেভাবে যত্রতত্র রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে! তাদের টপকে এগোনোর সাধ্য আছে গাড়িঘোড়ার? তার উপর বউবাজারের রাস্তা তো অকহতব্য। ট্রাম, বাস, টানারিকশা, ট্যাক্সি, ঠেলাগাড়িতে তো থিকথিকে জ্যাম। পার্থর প্রেস পর্যন্ত তো পৌঁছো:তেও পারল না গাড়ি। যানজট আর ভিড়ের চোটে বেশ খানিকটা আগে মারুতিকে রাখতে হল। তারপর ধাক্কা খেতে-খেতে বাকি পথটুকু হন্টন।

পার্থর প্রেসে আগে কখনও আসেনি টুপুর। চেহারা দেখে একটু বুঝি হতাশই হল। আদ্যিকালের এক জীর্ণ বাড়ির নীচের তলায় দু'খানা ঘর নিয়ে পার্থর ছাপাখানা। রাশিরাশি কাগজ গড়াগড়ি খাচ্ছে মেঝেয়, কোণেও দাঁড় করানো আছে নানান রঙের কাগজের রোল। তার মাঝেই কম্পিউটার, ডি টি পি মেশিন, চেয়ার, টেবিল, কাঠের র‍্যাক...। একটা ঘরে কম্পোজের কাজ চলছে, অন্যটায় মুদ্রণ। ভিতরে নড়াচড়ার জায়গা এত কম, পা রাখলেই যেন দমবন্ধ হয়ে আসে। দুটো ঘরেই অবশ্য এ সি চলছে, এটাই যা বাঁচোয়া!

মিতিন-টুপুরকে দেখে পার্থ ব্যস্ত হয়ে পড়ল। চা, কফি, না ঠান্ডা

পানীয় কী আনাবে ভেবে পেল না। শেষে বুদ্ধি করে ডাব আনতে পাঠাল একজনকে। টুপুরকে বলল, "তোদের পেটে কিছু পড়েছে? নাকি খাবার আনাব?"

"আমাদের নিয়ে চিন্তা পরে।" মিতিনের কেজো প্রশ্ন, "কাজটা হল কি?"

"ও শিয়োর। শ্যামল আমার মান রেখেছে। এইমাত্র ফোন করেছিল।" বলতে-বলতে টেবিল থেকে একটা চিরকুট তুলে পড়ল পার্থ, "লাস্টে ছয় আর নয় নাম্বারওয়ালা একটা কালো হন্ডা সিটির সন্ধান মিলেছে। পুরো নাম্বার টু ওয়ান সিক্স নাইন। দু' হাজার আট সালের গাড়ি, রেজিস্ট্রেশনটা কমার্শিয়াল, অর্থাৎ ভাড়া খাটে। মালিকের নাম দ্বিজেন হালদার। কার রেন্টের ব্যাবসা আছে। ঠিকানা, সেভেন বি, মিড্‌লটন রো। ফোন নাম্বার...!'

"লাগবে না।" মিতিন একটা টুল টেনে বসে ছিল, তড়াক উঠে দাঁড়াল, "চল টুপুর, বেরিয়ে পড়ি। দ্বিজেন হালদারকে এক্ষুনি মিট করতে হবে।"

"আহা, ডাবটা তো খেয়ে যাও।"

"সময় নেই, পার্থ। মিড্‌লটন রো যেতে কতক্ষণ আবার লাগে! গিয়ে লোকটাকে পাব, কি পাব না, কে জানে!" মিতিন ঘড়ি দেখল, "তুমিও সঙ্গী হতে পারো। যদি অবশ্য কাজের প্রেশার না থাকে।"

পার্থ বুঝি মুখিয়েই ছিল। কর্মচারীদের নির্দেশ দানের পালা সেরে সে তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত। চোখে রোদচশমা চড়িয়ে বেরিয়ে পড়ল প্রেস ছেড়ে। গাড়িতে এসে নিজেই চালকের আসনে বসল।

ছুটল গাড়ি। দক্ষিণ মুখে।

ভিতরে-ভিতরে দারুণ একটা উত্তেজনা অনুভব করছিল টুপুর। কী চমৎকার সরল গতিতে এগোচ্ছে তদন্ত। কিডন্যাপারের কল থেকে একটা ফোনবুথের সূত্র মিলেছিল, সেখানে হানা দিয়ে

তাদের পুরোপুরি নিরাশ হতে হয়নি। অন্তত এটুকু তো অনুমান করা গেল, অপরাধীরা কোন অঞ্চলের! মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে গাড়ির হদিশও হাতের মুঠোয়। এবার নিশ্চয়ই অপরাধীর টুঁটি চেপে ধরতে অসুবিধে হবে না! বেচারা রনিটাকে যদি আজই উদ্ধার করা যায়...!

সাতের বি মিড্‌লটন রো মোটেই দ্বিজেন হালদারের বসতবাড়ি নয়। ঠিকানাটি কার রেন্টাল অফিসেরই। আরও অনেক অফিস আর দোকানপাটের মাঝে ফালি ঘরে 'স্টার টুরস অ্যান্ড ট্রাভেল্‌স'। খুদে অফিসটি রীতিমতো ঝাঁ চকচকে। দ্বিজেন হালদার মানুষটিও বেশ কেতাদুরস্ত। সবুজ সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপারে ঘোরানো-চেয়ারে আসীন। সামনে ল্যাপটপ। চারপাশে সুদৃশ্য কাঠের প্যানেলিং করা দেওয়ালে পৃথিবীর বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানের ফোটো। একটি গণেশের মূর্তিও আছে। দ্বিজেন হালদারের ঠিক মাথার উপরে, কাচের তাকে। টাটকা মালা পরানো। ধূপের গন্ধও আবছাভাবে নাকে আসে যেন।

ল্যাপটপে আঙুল চলছিল দ্বিজেন হালদারের। মিতিনদের উপস্থিতি টের পেয়ে চোখ তুললেন সুট-টাই পরা বছর পঞ্চাশের মানুষটি। চেয়ারে হেলান দিয়ে কেতাবি ঢঙে বললেন, "ইয়েস? হাউ ক্যান আই হেল্‌প ইউ?"

পার্থকে শেখানোই ছিল। কাঁধ ঝাঁকিয়ে পার্থ বলল, "আমাদের একটা গাড়ি চাই। কাল দুপুরে।"

"আপনারা কে? কোত্থেকে আসছেন?"

"সেটা জানা বুঝি খুব জরুরি?" পার্থও কায়দা মেরে বলল, "ওয়েল, আমি হরিসাধন সরকার, ইনি আমার স্ত্রী তারাসুন্দরী সরকার, আর এই মেয়েটি হল...!"

"এক সেকেন্ড।" দ্বিজেন হাত তুলে থামালেন পার্থকে।

তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, "সরি স্যার। আমরা পার্সোনালি কাউকে গাড়িভাড়া দিই না।"

"সে কী? কালই তো এখান থেকে একটা কালো হন্ডা সিটি, যার নাম্বার টু ওয়ান সিক্স নাইন, কোনও একজনকে ব্যক্তিগতভাবে ভাড়া দিয়েছিলেন!"

দ্বিজেন হালদারের ভ্রূ-তে ভাঁজ। বিরক্ত স্বরে বললেন, "আপনারা ঠিক কে বলুন তো? কী চান, অ্যাঁ?"

পার্থ নয়, এবার মিতিন মুখ খুলল। আই-ডি কার্ড বাড়িয়ে দিয়ে শীতল গলায় বলল, "নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, অকারণে আসিনি? আশা করি আপনার সহযোগিতা পাব?"

যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হলেন দ্বিজেন। একটুক্ষণ গুম থেকে কাঠ-কাঠ গলায় বললেন, "আপনাদের প্রশ্নের জবাব দিতে আমি বাধ্য নই। তবে আমি কোনও ঝঞ্ঝাট-ঝামেলাও চাই না। বলুন আপনাদের কী জানার আছে?"

"ওই বিশেষ গাড়িটি কাল ভাড়া খাটতে গিয়েছিল কি?"

"হ্যাঁ।"

"রাতে নিশ্চয়ই ফিরেছে?"

"না। পার্টি চারদিনের জন্য নিয়েছে গাড়িটা। তাদের কোনও গেস্ট এসেছে ফরেন থেকে, গাড়ি নিয়ে অতিথিরা মন্দারমণি গিয়েছে।"

"কাল কখন থেকে ভাড়া ছিল গাড়ি?"

"দুপুর থেকে। বেলা দুটোয় রিপোর্টিং ছিল।"

"কোথায়?"

"এটাও বলতে হবে?" দ্বিজেনের স্বর রুক্ষ, "বেলেঘাটা। টাওয়ার অফ সাইলেন্সের গেটে।"

মিতিনের দৃষ্টি চকিতে স্থির, "আপনার পার্টির নাম জানতে পারি?"

দ্বিজেন ক্ষণকাল চুপ। তারপর যেন খানিক ইতস্তত করে বললেন, "এঁরা আমার খুব পুরনো ক্লায়েন্ট। প্রায়শই অফিশিয়াল কাজে আমার গাড়ি নেন...! কার্পেট ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের ব্যাবসা তো, মাঝে মাঝেই বাইরে থেকে লোক আসে...!"

"আপনি কাদের কথা বলছেন?"

"রুস্তমজি জরিওয়ালা। যাঁদের ফ্যান্টাসি ব্র্যান্ডের কার্পেট আছে।"

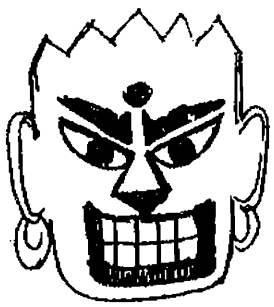

এমন তাজ্জব জীবনে হয়নি টুপুর। ভদ্রলোক বলছেনটা কী? খোদ শেঠ রুস্তমজি কালো হন্ডা সিটিটা চেয়ে পাঠিয়েছিলেন? আর সেই গাড়িতেই কিনা রনি নিখোঁজ?

পার্থরও চক্ষু ছানাবড়া হওয়ার দশা। ধন্ধমাখা মুখে একবার টুপুরকে দেখল, পরক্ষণে মিতিনকে। প্রায় পেন্ডুলামের মতো ঘুরছে তার মাথা। কী যেন বলতে গেল মিতিনকে, স্বর ফুটল না।

মিতিনও প্রথমটায় চমকেছিল। তবে সামলে নিয়েছে এখন। স্বাভাবিক গলাতেই ফের জিজ্ঞেস করল, "গাড়ির জন্য কবে ফোন করেছিলেন রুস্তমজি?"

দ্বিজেন হালদার মুখ বেঁকিয়ে বললেন, "আশ্চর্য, মিস্টার জরিওয়ালা কেন ফোন করতে যাবেন? তাও এত সামান্য ব্যাপারে? ফোন এসেছিল ওঁর অফিস থেকে।"

"কে করেছিলেন?"

"অতশত বলতে পারব না। কেউ একজন করেছিল, গাড়ি চলে

গিয়েছে, ব্যস।" দ্বিজেন হালদার ঈষৎ তেরিয়া, "আপনারা এসব জেনে কী করবেন?"

উত্তর না দিয়ে পালটা প্রশ্ন জুড়ল মিতিন, "রুস্তমজির নাম করে যে-কেউ ফোনে গাড়ি চাইলেই আপনি পাঠিয়ে দেন?"

"এমন বেঁকিয়ে-চুরিয়ে বলছেন কেন?" দ্বিজেন যেন এবার বেশ ক্ষিপ্ত। সামান্য চড়া গলাতেই বললেন, "হ্যাঁ, দিই। মিস্টার জরিওয়ালার সঙ্গে এভাবেই আমার বিজনেস চলছে আজ পনেরো বছর ধরে। জাস্ট একটা রিং পেলেই গাড়ি চলে যায়। কখনও ওঁর অফিস, কখনও এয়ারপোর্ট, কখনও হোটেল... এনি ড্যাম প্লেস, যেখানে ওঁরা হুকুম করেন। মাসের শেষে থোক বিল পাঠাই, দিন পনেরোর মধ্যে পেমেন্ট এসে যায়। আমার সিস্টেমে কি ভুলচুক আছে কোনও?"

এবারও প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল মিতিন। নিরীহ স্বরে বলল, "ওঁরা কি কাল ওই হন্ডা সিটিটাই চেয়েছিলেন?"

"অবশ্যই। নইলে আমি পাঠাব কেন? বিশেষ কোনও নির্দেশ না থাকলে ইন্ডিকা-ফিন্ডিকা গোছের কিছু যায়।"

"আপনার কি ওই একটাই কালো হন্ডা সিটি?"

"হ্যাঁ। কালো রঙে একটা আভিজাত্য আছে তো, অনেক ক্লায়েন্টই ওটা লাইক করেন।"

"মিস্টার জরিওয়ালার অফিসে ওই গাড়িটি কি এবার প্রথম গেল?"

দ্বিজেন হালদার একটু ভেবে বললেন, "বোধহয়। সাধারণত কোনও বড় হোটেল-টোটেলই তো গাড়িটা বুক করে।"

"আর-একটা প্রশ্ন না করে পারছি না মিস্টার হালদার। গাড়িটা যে টাওয়ার অফ সাইলেন্সে পাঠাতে বলা হল, এতে আপনি অবাক হননি?"

"ভাবলাম, মিস্টার জরিওয়ালার কোনও পারসি গেস্ট এসেছেন।" বলতে-বলতে দ্বিজেন হালদারের ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপের রেখা, "দেখুন ম্যাডাম, অবাক হওয়া আমার পেশা নয়। ক্লায়েন্টদের সন্তুষ্ট রাখাটাই আমার কাজ। তাঁরা চাইলে ধাপার মাঠেও আমি গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিতে পারি।"

"বুঝলাম।" মিতিন তর্জনীটা তুলল, "আচ্ছা, মিস্টার জরিওয়ালারাই কাল গাড়িটা নিয়েছেন, এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত তো?"

"মানে? আর কে নেবে?"

"একবার ফোন করে কনফার্মড হয়ে নিলে হত না?"

দুম করে মেজাজ হারালেন দ্বিজেন হালদার, "আপনারা এবার আসুন তো ম্যাডাম। কী ব্যাপারে, কাকে নিয়ে তদন্ত করতে এসেছেন আমি জানি না। তবে এখানে গোয়েন্দাগিরি ফলিয়ে কোনও লাভ নেই। দ্বিজেন হালদার আজ পর্যন্ত কোনও কাঁচা কাজ করেনি। করেও না।"

"বেশ। চলি তা হলে। আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করার জন্য দুঃখিত।"

মিতিন বেরিয়ে আসছিল, পিছন থেকে দ্বিজেন হালদারের গলা উড়ে এল, "ম্যাডাম, আপনার কার্ড ফেলে গেলেন যে!"

ঘুরে দাঁড়িয়ে মিতিন মিষ্টি করে হাসল, "ওটা থাক। আপনার দরকার হতে পারে।"

বিচ্ছিরি একটা মুখভঙ্গি করলেন দ্বিজেন হালদার। বঙ্কিম হেসে বললেন, "ওকে। থাক। অ্যাজ ইউ প্লিজ।"

বাইরে এসে পার্থ গরগর করে উঠল, "আচ্ছা খিটকেল লোক তো! ভালভাবে কথা বলতে জানে না!"

মিতিন আলগাভাবে বলল, "গোয়েন্দা দেখলে কে আর খুশি হয়?"

"ভদ্রলোকের হাবভাব কিন্তু বেশ সন্দেহজনক গো মিতিনমাসি।" টুপুর ফুট কাটল, "একবার জানতে পর্যন্ত চাইলেন না, কেন হঠাৎ অফিসে ডিটেকটিভ এসেছে!"

"এই ধরনের লোকদের কী বলে জানিস? ওভার কনফিডেন্ট। একদিক দিয়ে দেখলে এরা খুব নির্বোধও। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের কারণেই ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে।"

হাঁটতে-হাঁটতে পার্কিং-লটে এল তিনজনে। পার্থই চালকের আসনে বসল। মিতিন তার পাশে। পিছনে টুপুর।

গাড়ির চাবি ঘুরিয়ে পার্থ জিজ্ঞেস করল, "নেক্সট গন্তব্য কী জানতে পারি?"

"ভাবছি।"

"রুস্তমজির অফিসে একবার ঢুঁ মারবে নাকি?"

"না, থাক। বাড়িই চলো। টায়ার্ড লাগছে।"

"বিকেল পাঁচটাতেই দম ফুড়ুৎ?"

"যা কিছু ভাবতে পারো। তবে আজকের পক্ষে এটুকুই যথেষ্ট।"

"ফেরত পথে তা হলে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হসপিটালের কাছটায় দাঁড়াই! কয়েক প্লেট স্টিম্ড মোমো কিনে নিই? পেটটা চুঁইচুঁই করছে। দুপুরে জমিয়ে টিফিনটা হল না...!"

"কেনো। টুপুরেরও নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে।"

"বুমবুমটাও মোমো খুব ভালবাসে।"

"হুম।"

গাড়ি দৌড় শুরু করার পর মিতিনের মুখে আর বাক্যিটি নেই। কী যেন ভাবছে। ভেবেই চলেছে। পথে মোমো কেনা হল, চিপ্‌স আর কোল্ড ড্রিঙ্কস খেল পার্থ-টুপুর, মিতিন যেন দেখেও দেখল না।

টুপুরও বেশি ঘাঁটাল না মিতিনমাসিকে। চিন্তার সময় খোঁচাখুঁচি করলে মাসি রেগে যায়।

বাড়ি ঢুকেই মিতিন সোজা স্নানে। শীতল জলধারায় বুঝি তাজা করছে শরীর-মন।

পার্থ আর টুপুর মোমো নিয়ে বসে গেল। বুমবুমও লাফাতে-লাফাতে হাজির। টপাটপ তুলে গপাগপ পুরছে মুখে। সুড়ুৎ-সুড়ুৎ চুমুক মারছে চিকেন স্টকে। আরতি কফিও বানিয়ে দিল চটপট।

খেতে-খেতে পার্থমেসোর সঙ্গে তর্ক চলছিল টুপুরের। ওই দ্বিজেন হালদার লোকটাকে নিয়েই। টুপুরের ধারণা, দ্বিজেন হালদার নিশ্চয়ই অপহরণ কেসে যুক্ত, পার্থ মোটেই সহমত নয়। যুক্তি, পালটা যুক্তির কাটাকুটি বেধেছে জোর।

টকটকে লাল চাটনিতে চিকেন মোমো মাখাতে-মাখাতে পার্থ বলল, "মাথা ঠান্ডা করে ভাব। আমরা তিন-তিনজন হানা দিয়েছি...। ক্রাইমের সঙ্গে জড়িয়ে থাকলে লোকটা কি একটুও ব্যাকফুটে যেত না?"

"আরে বাবা, রুস্তমজি ডিটেকটিভ লাগিয়েছেন, এ সংবাদ তো এখন ক্রিমিনালদের অজানা নেই। দ্বিজেন হালদার তাই হয়তো আগে থেকেই অ্যালার্ট ছিলেন। ইচ্ছে করে মিসলিড করছিলেন আমাদের। শেঠ রুস্তমজির নাম জড়িয়ে কেসটাকে যদি ঘেঁটে দেওয়া যায়...!"

"আমার কিন্তু তা মনে হয় না। তোর মাসি রুস্তমজিকে একটা ফোন করলেই তো সত্যি-মিথ্যেটা ফাঁস হয়ে যাবে। আর এই বুদ্ধিটুকু নিশ্চয়ই ভদ্রলোকের ঘটে আছে! আমার রিডিং, দ্বিজেন হালদার অভদ্রতা করেছে বটে, কিন্তু নাটক করেনি।"

"অর্থাৎ কেউ একজন ফোনে গাড়ি চেয়েছিল, আর ভদ্রলোক অমনি কোনও কিছু যাচাই না করে রুস্তমজিদের নামে হন্ডা সিটিখানা পাঠিয়ে দিলেন?"

"এরকমটা হয়েই থাকে টুপুর। একে নামী কোম্পানি, তায় পুরনো ক্লায়েন্ট, এ ক্ষেত্রে নিয়মকানুনের কড়াকড়ি খুব একটা থাকে না রে। জাস্ট একটা ফোনকলই যথেষ্ট।"

"যদি তোমার লজিক মেনেও নিই..., দ্বিজেন হালদারের মনে কি একবারও প্রশ্ন জাগল না, গাড়িটাকে কোথায় রিপোর্ট করতে বলা হচ্ছে? স্টেশন নয়, এয়ারপোর্ট নয়, হোটেল কিংবা অফিস নয়..., গাড়ি যাবে কিনা সেই টাওয়ার অফ সাইলেন্সে? কথাটা কি একটু সাজানো লাগে না?"

"এটাই তো প্রমাণ করে, রুস্তমজির অফিস থেকেই গাড়িটা চাওয়া হয়েছিল।"

"আশ্চর্য, শহরে এত জায়গা থাকতে টাওয়ার অফ সাইলেন্স কেন?"

"টাওয়ার অফ সাইলেন্স কী জানিস?"

"খুব জানি। পারসিদের সিমেট্রি। পারসি ধর্মে দাহ করা বা সমাধি দেওয়ার প্রথা নেই। ওরা একটা মিনারের চূড়ায় ডেডবডি রেখে আসে, চিল-শকুনে সেই মৃতদেহ খায়।"

"কারেক্ট। পারসিরা মনে করে, অন্য কোনও পদ্ধতিতে মৃতদেহ সৎকার হলে আগুন, মাটি আর জল অপবিত্র হবে।" সুযোগ পেয়ে পার্থ জ্ঞান বিতরণ করল, "কলকাতায় প্রথম টাওয়ার অফ সাইলেন্স, পারসিদের ভাষায় যাকে বলে 'দখ্মা', তৈরি হয়েছিল আঠেরোশো বাইশ সালে। যিনি বানিয়েছিলেন তাঁরও নাম রুস্তমজি। পুরো নাম, রুস্তমজি কাওয়াস্জি বানাজি। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদা প্রিন্স দ্বারকানাথের বন্ধু। পরে প্রথমটি বন্ধ করে দ্বিতীয় দখ্মাটি বানানো হয়। উনিশশো বারো সালে।"

"তো?" টুপুর রীতিমতো অসহিষ্ণু। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "এর সঙ্গে কেসের কী সম্পর্ক?"

"নেই। আবার আছেও। এটুকু তো অন্তত পরিষ্কার হল, গাড়িটা নিশ্চয়ই কোনও পারসি...!"

"ঘোড়ার মাথা।" মিতিন ঘরের দরজা থেকে টিপ্পনী ছুড়ল হঠাৎ। ভিজে চুল আঁচড়াতে-আঁচড়াতে এসে বসল সোফায়। ভ্রূ নাচিয়ে বলল, "যত সব আজগুবি ভাবনা মাথায় আসে কোত্থেকে? গাড়ি বেলেঘাটার টাওয়ার অফ সাইলেন্সে গেলে কোনও পারসিই সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবে, এমনটা ধরে নেওয়ার কি কোনও কারণ আছে?"

"আমিও তো তাই বলছি।" টুপুর কলকল করে উঠল, "মেসো খামোখা এই কেসে পারসিদের ঢোকাচ্ছে। কিছুতেই বুঝতে চাইছে না, এটা দ্বিজেন হালদারের একটা চাল।"

"চাল, না ভাত, এক্ষুনি দেখতে পাবি।" চিরুনি রেখে একখানা মোমো তুলল মিতিন। কামড় দিয়ে বলল, "দশটা মিনিট অপেক্ষা কর। নিউজ আসছে।"

আরতি মিতিনের কফি আনল। টেবিলে কাপ রেখে বলল, "আমি তা হলে এবার রওনা দিই?"

"রুটিটুটি সব কমপ্লিট?"

"হ্যাঁ। ঝাল-ঝাল আলুর দমও বানিয়েছি। সঙ্গে মেটে-চচ্চড়ি।"

"আয় তা হলে। মোমো খেয়েছিস?"

"হ্যাঁ। দাদা দিয়েছে।"

"আরও তো অনেক রয়েছে, তোর মেয়ের জন্য দু'-চারটে নিয়ে যা। শাশুড়ির জ্বর হয়েছে বলছিলি, সেরেছে?"

"না গো। ভাবছি আজ ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব।"

"দেখিস বাবা, সিজন চেঞ্জের সময় নানান রোগব্যাধি হয়। মেয়েকেও সাবধানে রাখিস। সারাদিন ঠাকুরমার কাছে থাকে, তার যেন ছোঁয়াচ না লাগে।"

ঘাড় নেড়ে গোটাচারেক মোমো ঠোঙায় ভরে নিল আরতি। ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়েছে কি বেরোয়নি, মিতিনের মোবাইলে ঝংকার।

খুদে যন্ত্রটি কানে চেপেই মিতিনের ঠোঁটে মুচকি হাসি। মাইক্রোফোনের বোতামটা টিপে দিয়ে বলল, "আরে, দ্বিজেনবাবু যে? এত তাড়াতাড়ি আমায় স্মরণ করলেন যে বড়?"

দ্বিজেন হালদারের আর্তস্বর ধ্বনিত হল, "সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে ম্যাডাম! আমি তো ধনেপ্রাণে মারা গেলাম!"

"কেন?" মিতিনের গলায় মধু ঝরছে, "কী হল?"

"আপনারা যাওয়ার পর মনটা কেমন খচখচ করছিল। হঠাৎ এসে এত প্রশ্ন করলেন...! নির্ঘাত কোনও কারণ আছে...! তবু রুস্তমজির অফিসে ফোন করতে পারছিলাম না, যদি ওঁরা কিছু মাইন্ড করেন...! শেষে মরিয়া হয়ে এই খানিক আগে অশোকবাবুকে ফোন করেছিলাম।"

"অশোকবাবু মানে মিস্টার জরিওয়ালার প্রাইভেট সেক্রেটারি?"

"হ্যাঁ ম্যাডাম। উনিই তো বেশিরভাগ সময় যোগাযোগ করেন। এবার অবশ্য উনি ফোন করেননি...! তখনই আমার সতর্ক হওয়া উচিত ছিল...! আজকাল যা সব কাণ্ড ঘটছে...!"

"আহা, কী হয়েছে বলবেন তো?"

"অশোকবাবু যা বললেন, তাতে তো আমার আক্কেল গুড়ুম। ওঁদের অফিস থেকে কাল নাকি কোনও গাড়িই চাওয়া হয়নি! শুধু তাই নয়, গত পনেরো দিনের মধ্যে রুস্তমজিদের কোনও গেস্টও আসেননি কলকাতায়!"

"অর্থাৎ আপনার গাড়ি গায়েব, তাই তো?"

"সেরকমই তো দাঁড়ায়। আমার ড্রাইভারকে রিং করলাম, এক-দু'বার নয়, বারদশেক। এক উত্তর আসছে, মোবাইলটি এখন বন্ধ আছে!"

"খুবই দুঃসংবাদ। আমি অবশ্য এরকমই কিছু আন্দাজ করেছিলাম।" মিতিনের স্বরে এতটুকু হেলদোল নেই। ঠান্ডা গলায় বলল, "এখন কী করবেন?"

"ভেবে পাচ্ছি না। আপনিই বলুন...! আমার নিশ্চয়ই এক্ষুনি পুলিশকে জানানো উচিত?"

"সেটাই নিয়ম। তবে এ ক্ষেত্রে আপনার একটু বিপদ আছে। হাতে হাতকড়িও পড়তে পারে।"

"কেন?" দ্বিজেন হালদারের গলা কাঁপল, "কী করেছি আমি?"

"কাল দুপুর তিনটে নাগাদ আপনার ওই হন্ডা সিটিতে সেন্ট পিটার্স স্কুলের একটি বাচ্চাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। শুনলে আপনার আরও খারাপ লাগবে, অপহৃত বাচ্চাটি শেঠ রুস্তমজি জরিওয়ালার একমাত্র সন্তান।"

"অ্যাঁ, অ্যাঁ, অ্যাঁ?" বিস্ময় আর আতঙ্ক একসঙ্গে ঠিকরে উঠল ওপারে। তারপর বেশ কয়েক সেকেন্ড কোনও আওয়াজ নেই। অবশেষে ফের সরব হলেন দ্বিজেন হালদার। ফ্যাসফেসে গলায় বললেন, "কই, অশোকবাবু তো আমায় কিছু বললেন না?"

"মিস্টার জরিওয়ালা ঘটনাটি যথাসম্ভব গোপন রেখেছেন। অশোকবাবুরও জানার কথা নয়।"

"ও। আপনি বুঝি মিস্টার জরিওয়ালার ছেলের কেসের ব্যাপারেই?"

"হ্যাঁ। আমি রনিকে খুঁজছি।"

"বিশ্বাস করুন ম্যাডাম, আমি বিন্দুবিসর্গ জানতাম না। আমার গাড়ি গিয়েছে, ক্লায়েন্টও গেল, আজ হোক, কাল হোক, পুলিশও আমায় ধরবে...! কী গাড্ডায় যে পড়লাম!"

"আমার একটা বুদ্ধি নেবেন?"

"হ্যাঁ, বলুন, বলুন। আমি একটি আস্ত বুরবক, দয়া করে আমাকে সাহায্য করুন।"

"আপাতত মুখে চাবি দিয়ে রাখুন। অন্তত কাল আর পরশু, দুটো দিন। ঘুণাক্ষরেও কাউকে কিছু জানাবেন না, রুস্তমজির অফিসেও আর যোগাযোগ করবেন না। পুলিশের হ্যাপাটা আমি দেখছি। যদি অপকর্মের ভাগীদার না হন, নির্ভয়ে থাকতে পারেন।"

"গাড়িটা ফেরত পাব তো? প্রায় দশ লাখ টাকা দাম...!"

"দেখা যাক, আপনার কপালে কী আছে!"

কথা শেষ হতেই অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল পার্থ। দু'হাতে তালি বাজিয়ে বলল, "বেড়ে মজা, বেড়ে মজা! সিংহের রোয়াব ছেড়ে দ্বিজেন হালদার এখন নেংটি ইঁদুর! আর-একটু স্ক্রু টাইট দিলে না কেন?"

"ভুল করছ পার্থ, কাউকে জব্দ করা আমার কাজ নয়।" মিতিনের শান্ত জবাব, "আমার এখন একটাই টার্গেট, ক্রিমিনালদের পাকড়াও করা।"

"এবং রনিকে অক্ষত দেহে উদ্ধার।" টুপুর বাকিটা যোগ করে দিল, "আমাকে তো রনির চিন্তাই বেশি কুরে-কুরে খাচ্ছে।"

"সেই দুর্ভাবনা কি আমারও নেই রে?" মিতিন শুকনো হাসল, "রনিকে যারা ধরে রেখেছে, তারা অত্যন্ত ধড়িবাজ। পুলিশ বা গোয়েন্দাকে ঠকানোর জন্য তাদের বন্দোবস্ত প্রায় নিখুঁত।"

"যা বলেছ। গাড়ির ক্লুটাও কেমন যেন পিছলে গেল। কে গাড়ি নিয়েছে, বোঝার তো কোনও জো রাখেনি।"

"তাতে কী! না চাইতেই দু'-চারটে সূত্র তো হাতে এসেইছে। কিছু ফাঁকফোকরও।"

"যেমন?"

"প্রত্যেকের স্টেটমেন্ট খুঁটিয়ে স্মরণ কর।" মিতিন কফিতে চুমুক

দিল, "এনিওয়ে, আমি যা স্মেল পাচ্ছি, তাতে মনে হচ্ছে রুস্তমজির অনুমানই সঠিক। টাকাটাই তাদের মূল লক্ষ্য। খুনখারাপিতে যাওয়ার মতো হিম্মত তাদের হবে না।"

পার্থ চোখ কুঁচকে বলল, "তুমি যেন তাদের মনের কথা পড়ে ফেলেছ?"

"কিছুটা তো বটেই। আমার প্রেডিকশন সহজে ভুল হয় না। দেখলে তো, দ্বিজেন হালদারের ফোন কেমন এসে গেল!"

"ওটা তো স্রেফ ঝড়ে বক। দ্বিজেনবাবু যদি রুস্তমজির প্রাইভেট সেক্রেটারিকে ফোন না করতেন, তা হলেই তোমার কেরামতি গন।"

"একেই তো থটরিডিং বলে স্যার। আমি একশো পার্সেন্ট শিয়োর ছিলাম, ভদ্রলোক রুস্তমজির অফিসে কনট্যাক্ট করবেনই।"

"ধরো, যদি না করতেন?"

"তা হলে তো কেস অবিলম্বে সলভ্ড। দ্বিজেন হালদারকে খোদ কিডন্যাপার বলে কোমরে দড়ি পরাতাম।" মিতিন মুখ টিপে হাসল, "এক্ষুনি আর-একটা ভবিষ্যদ্বাণী করব?"

"কী?"

"রাতে আজ আর-একটা ফোন আসবে।"

"এটা বলতে টিকটিকি হওয়ার প্রয়োজন নেই।" পার্থ হা-হা হাসছে, "তোমার ক্লায়েন্ট নিশ্চয়ই রাত্তিরে একটা কল করবেন!"

"আমি রুস্তমজির কথা বলিনি। উনি তো করবেনই। অন্য একজনের কথা বলছি।"

টুপুর বলল, "আমি বলব?"

"শুনি।"

"রনিদের স্কুলের প্রিন্সিপাল-ম্যাডাম। ভদ্রমহিলা খুব টেনশনে আছেন।"

"তিরটা ভালই ছুড়েছিলি। তবে একটুর জন্য ফসকাল।" টুপুরের মাথায় আলগা চাঁটি মেরে মিতিন বলল, "ফোনটা আসবে রনির ক্লাসটিচারের, মিস প্রিয়াঙ্কার।"

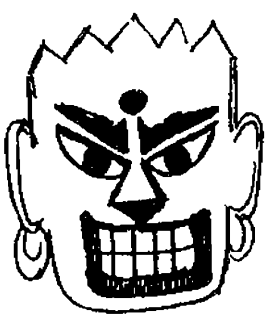

ছেঁড়া-ছেঁড়া একটা স্বপ্ন দেখছিল টুপুর। এক গভীর জঙ্গল..., বুমবুম ঝোপঝাড়ের মাঝখানে কম্পিউটার বসিয়ে রোডর‍্যাশ খেলছে...। হঠাৎই দুই মুশকো খেলুড়ে বেরিয়ে এল মনিটরের কালো গাড়ি থেকে...। মুখ বেঁধে ফেলল বুমবুমের...। পাঁজাকোলা করে বুমবুমকে তুলল গাড়িটায়...। কম্পিউটারের পরদায় ফের ছুটল গাড়ি...। টুপুরও দৌড়োল পিছন-পিছন...। আচমকা সামনে এক পাহাড়...। লোক দুটো বুমবুমকে পাহাড়ের গুহায় ধাক্কা মেরে ঢুকিয়ে দিল...। প্রকাণ্ড একখানা পাথর এনে আটকে দিল গুহার মুখ...। কোত্থেকে তখনই প্রিয়াঙ্কাম্যাডাম আর রনিদের স্কুল-গেটের সেই দরোয়ানটা হাজির...। টুপুর ছুট্টে প্রিয়াঙ্কাম্যাডামের কাছে গেল...। প্রিয়াঙ্কাম্যাডাম হাত বাড়িয়ে দিলেন, 'কার্ড কই, কার্ড...!' টুপুর চিৎকার করে কিছু বলতে চাইল, কিন্তু স্বর ফুটল না...। পিছন থেকে কে যেন ডাকল টুপুরকে...। একবার ডাকল, দু'বার...!

ওই ডাকেই বুঝি বিকট স্বপ্নখানা ভেঙে খানখান। চমকে চোখ খুলে টুপুর দেখল, সামনে মিতিনমাসি। হাতে চায়ের কাপ।

ভ্রূ কুঁচকে মিতিনমাসি বলল, "কী রে, উঠবি না?"

এখনও স্বপ্নের রেশটা কাটেনি টুপুরের। চোখ রগড়ে বলল, "অনেক বেলা হয়েছে বুঝি?"

"সাড়ে সাতটা। আমার কত কাজ হয়ে গেল, তুই এখনও পড়ে-পড়ে ঘুমোচ্ছিস?"

"কী কাজ করলে?" টুপুর ধড়মড়িয়ে উঠে বসল।

"অনিশ্চয়দার সঙ্গে কয়েকটা দরকারি কথা সেরে নিলাম। রুস্তমজির সঙ্গে কিছু বাতচিত হল...!"

"কিডন্যাপিং-এর খবরটা অনিশ্চয় আঙ্কলকে জানিয়ে দিলে নাকি?"

"ঝেড়ে কাশিনি, তবে সামান্য হিন্ট দিয়ে রেখেছি। আল্টিমেটলি পুলিশকে তো লাগবেই। তা ছাড়া পদে-পদে কত ইনফরমেশন চাইতে হচ্ছে...।" চায়ে চুমুক দিয়ে চোখে একটা রহস্যময় হাসি ফোটাল মিতিন, "তোর বাবাকেও একটা ফোন লাগিয়েছিলাম।"

"আমার বাবাকে? কেন গো?"

"হঠাৎ মনে পড়ল, তোর বাবার একবার পারসিয়ান ভাষা শেখার খুব ঝোঁক চেপেছিল। ভাবলাম, সেই সূত্রে যদি কোনও পারসি বন্ধুটন্ধু থাকে...!"

"আছে?"

"অবশ্যই। এক পারসি অধ্যাপকের সঙ্গেই নাকি তোর বাবার বেজায় খাতির। ভদ্রলোকের নাম রতন দস্তুর। কপালটা আমার এমনই ভাল, ওই রতন দস্তুর নাকি টানা আট বছর পারসি ক্লাবের সেক্রেটারি ছিলেন। কলকাতার পারসিকুলের হাড়হদ্দ তাঁর নখদর্পণে।"

"তো? পারসিদের খোঁজখবর জেনে কী হবে?"

"বা রে, রুস্তমজি মানুষটি কেমন, বাজিয়ে দেখতে হবে না? তাঁর সম্পর্কে ডিটেলে জানলে কোনও সমাধানসূত্র তো মিলতেও পারে!"

"মানে?"

"মানেটা পরে শুনিস। এখন ঝটাপট মুখটুখ ধুয়ে আয়, নাস্তা রেডি হচ্ছে।"

ভ্যাবলা মুখে দাঁত মাজতে গেল টুপুর। পেস্ট লাগাল ব্রাশে, দৃষ্টি বাথরুমের আয়নায়। হঠাৎ এ কী খেয়াল মিতিনমাসির? রুস্তমজিকে ঘাঁটাঘাঁটি করতে ইচ্ছে জাগল যে বড়? রুস্তমজি যেমনই হন, অপহরণের সঙ্গে তাঁর কী যোগ? নাকি মিতিনমাসি রুস্তমজির পরিবার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে চান? কোন দিকে গড়াচ্ছে মিতিনমাসির সন্দেহ? রুস্তমজির কোনও আত্মীয়স্বজন...? মাত্র এক কোটি টাকার লোভে নিশ্চয়ই রুস্তমজির ভাই অপকর্মটি করাননি! তাঁর নিজেরই তো অগাধ সম্পত্তি। তা হলে? কলকাতার পারসিমহলের কেউ? গাড়িটা টাওয়ার অফ সাইলেন্সে গিয়েছিল বলেই কি এমন একটা ধারণা জন্মাল মিতিনমাসির? কিন্তু কাল তো ওই পয়েন্টটাকে সেভাবে আমলই দেয়নি!

না, মিতিনমাসির থই পাওয়া দুষ্কর। কখন যে কোন দিকে মগজ ছোটাছুটি করে! অবশ্য মিতিনমাসির আন্দাজ যে খুব একটা ভুল পথে চলে না, এ প্রমাণ তো টুপুর কাল রাত্তিরেও পেয়েছে। রুস্তমজির আগেই ফোন এসে গেল প্রিয়াঙ্কাম্যাডামের। রনির পুরনো আই-কার্ডটি নাকি ঠিকঠাকই আছে, চাইলে প্রিয়াঙ্কাম্যাডাম মিতিনমাসির বাড়ি এসে দেখিয়ে যেতে পারেন। খুব কাকুতি-মিনতিও নাকি করছিলেন মহিলা, যাতে পুলিশকে না জানানো হয়, যেন তাঁর চাকরিটা বজায় থাকে...। মিতিনমাসি অবশ্য তাতেও বিশেষ গলেনি, বরং দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্য প্রিয়াঙ্কাম্যাড়ামের উপর এখনও বেশ ক্ষুব্ধ। তবে সম্ভবত মিতিনমাসির সন্দেহের তালিকা থেকে তিনি বাদ পড়েছেন।

টুকটাক চিন্তাগুলো মাথায় নাড়াচাড়া করতে-করতেই টুপুর খাওয়ার টেবিলে এল। কমিক্স মুখে একমনে দুধ-কর্নফ্লেক্স খাচ্ছে

বুমবুম। পার্থ খবরের কাগজে মগ্ন। আরতি পাহাড়প্রমাণ ফ্রেঞ্চ-টোস্ট বানিয়ে রেখে গেল, প্লেটে-প্লেটে তুলে দিল মিতিন।

খাবারের গন্ধেই বুঝি চোখ তুলল পার্থ। টেবিলের আহার্য বস্তু পর্যবেক্ষণ করতে-করতে বলল, "আজও কি তোমাদের হোল-ডে আউটিং? দুপুরে খেতে ফিরছ না?"

"সম্ভাবনা কম। হাতে তো মাত্র আর কয়েক ঘণ্টা।" মিতিন টম্যাটো সসের বোতলটা টানল। চোখ তেরচা করে বলল, "তুমি কি আজ আমাদের সঙ্গে থাকছ না?"

"থাকতেই পারি। প্রেসে একটা ফোন করে দিলেই তো আমি ফ্রি।" পার্থকে রীতিমতো চনমনে দেখাল, "বাই দা বাই, কোন পথে আজ যাত্রা শুরু?"

"প্রথমে রুস্তমজির অফিস যাব।"

"কেন?"

"প্রশ্ন নয়। গেলেই দেখতে পাবে।"

"রুস্তমজি কি আজই মুক্তিপণের টাকাটা রেডি করছেন?"

"কাল রাতে তো তাই বললেন।"

"তবে কিডন্যাপারদের ফরমায়েশ মতো টাকার ব্যবস্থা করতে কিন্তু কালঘাম ছুটে যাবে বেচারার।" পার্থ একখানা ফ্রেঞ্চ-টোস্ট তুলল। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে-দেখতে বলল, "কত ফ্যাচাং, ভাবো। বাবুরা নতুন নোট নেবেন না, হাজার টাকার নোট চলবে না, গোটাটাই চাই পাঁচশো আর একশোয়। ওভাবে এক কোটি ক্যাশ জড়ো করা সোজা কথা নাকি?"

টুপুর মুখ বেঁকিয়ে বলল, "লোকগুলো মহা শয়তান। কাল রাত্রিরে রুস্তমজিকে টাকার অর্ডার দিল, কিন্তু কোথায় দিতে হবে কিছুতেই ভাঙল না।"

"কিডন্যাপারদের তো ওটাই নিয়ম। খেলিয়ে-খেলিয়ে হুকুম জারি

করে, উলটোপালটা চরকি খাওয়ায়। এই যদি বলে 'টালায় এসো', তো দু'ঘণ্টা পরে বলবে 'টালিগঞ্জে অপেক্ষা করছি'। কখনওই সোজা পথে হাঁটবে না, মানুষকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়বে।"

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস, লোকগুলো পাকা খেলুড়ে। বারবার পাবলিক বুথে যাচ্ছে, ভুলেও মোবাইল ফোন ব্যবহার করছে না।"

"হুম। ওতে যে নেটওয়ার্ক দেখে বাবুদের অবস্থানটি ধরা সহজ হয়।" পার্থ চোখ সরু করল, "আচ্ছা মিতিন, কাল কোন বুথ থেকে ওরা ফোন করেছে, ট্রেস করা গেল?"

"শিয়োর। দমদমের যশোর রোড থেকে এবং এটি আগের বুথটার কাছেই।"

টুপুর অবাক হয়ে বলল, "এত তাড়াতাড়ি তুমি জানলে কীভাবে?"

"ভেরি সিম্পল। ওই নাম্বারে জাস্ট একটা কল।"

"ও মা, তা হলে আগের বার অনিশ্চয় আঙ্কলের সাহায্য নিলে কেন?"

"পুলিশকে একটু ছুঁইয়ে রাখতে হয়। নইলে কাল যখন হেল্প চাইব, অনিশ্চয়দার গোঁসা হতে পারে।" বলতে-বলতে মিতিনের নজর বুমবুমে। চোখ পাকিয়ে বলল, "অ্যাই, তুই হাঁ করে কী গিলছিস রে?"

বুমবুমের পিলে-চমকানো জবাব, "কেসটা স্টাডি করছি।"

টুপুরের চোখ বড়-বড়, "তুই জানিস কেসটা কী?"

"জানি তো। রনি বলে একটা ছেলে স্কুল থেকে কিডন্যাপড হয়েছে। এক কোটি টাকা র‍্যানসম চেয়েছে দুষ্টু লোকগুলো। মা ওই পাজি লোকগুলোকে ধরবে।"

"খুব হয়েছে। এখন দুধটুকুন শেষ করে ওঠো তো!" মিতিন লঘু ধমক দিল ছেলেকে, "গিয়ে স্কুলের বইখাতা ঠিকঠাক গুছিয়ে নাও। স্কুলবাস আসার মুহূর্তে এটা পাচ্ছি না, ওটা কোথায় গেল, এসব যেন শুনতে না হয়।"

টুপুর বলল, "আর শোন, স্কুলবাসে ওঠা-নামার সময় খুব সাবধান। চেনা-অচেনা কেউ ডাকলেও যাবি না। সোজা বাসে উঠবি, আর বাস থেকে নেমে স্ট্রেট বাড়ি।"

"জানি। তোকে জ্ঞান দিতে হবে না।"

আলোচনার আসর থেকে হঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে বেশ ক্ষুণ্ণ হল বুমবুম। তবে মা'র ভয়ে চলেও গেল টুপুরকে একটা ভেংচি কেটে।

ছেলেকে দেখতে-দেখতে পার্থ তারিফের সুরে বলল, "বুমবুমের কী আই-কিউ দেখেছ? চুপচাপ থাকে, কিন্তু সব অবজার্ভ করে।"

"এবং মগজে গেঁথে নেয়।" মিতিন আলতো হাসল, "ভাল গোয়েন্দাদের এই ফোটোগ্রাফিক মেমারিটা থাকা একান্তই জরুরি। একবার যা দেখবে বা শুনবে, সেটা ভোলা চলবে না।"

"বুমবুম বড় হয়ে তা হলে ডিটেকটিভ হবে বলছ?"

"উঁহু, তার জন্য অনেক চর্চা দরকার। আসলে বাচ্চাদের ফোটোগ্রাফিক মেমারিটা থাকে। এর সঙ্গে ঘটনা পরম্পরা সাজানো, সেগুলোকে সঠিক উপায়ে বিশ্লেষণ করার জন্য চাই দীর্ঘ অভ্যাস। নইলে শুধু গোয়েন্দার অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়েই থাকতে হবে টুপুরের মতো।"

টুপুরের আঁতে লাগল কথাটা। আহত মুখে বলল, "আমি কি কিচ্ছু বিশ্লেষণ করতে পারি না?"

"পারিস? আচ্ছা বল তো, কাল সারাদিনে কেসের কোন পয়েন্টটা তোকে বেশি স্ট্রাইক করেছে?"

"স্কুলের ওই আইডেন্টিটি কার্ডের ব্যাপারটা?" বলেই জোরে-জোরে মাথা নাড়ল টুপুর, "না না, ওই কালো হন্ডা সিটি...; মানে যেটা ভাড়া করা হয়েছিল।"

"ভেবেচিন্তে বল।"

"বুঝেছি। তুমি নিশ্চয়ই ফোন-বুথে আসা লোক দুটোর কথা বলছ? যারা সাইকেলে...!"

"তুত, ওগুলো তো কেসের সূত্র, ক্লু। স্ট্রাইকিং পয়েন্টটা আলাদা।"

"যেমন?"

"আমরা যে কেসটা টেকআপ করেছি, ক্রিমিনালরা তা জানল কী করে?"

"এটা কী এমন কঠিন? ঘটনাটা জানে তো মাত্র চারজন। রুস্তমজি, লীলাম্যাডাম, বি এম ডব্লিউর ড্রাইভার, আর কাজের মেয়েটি।" বলেই টুপুর তড়াক লাফিয়ে উঠল, "তারক, তারক। ড্রাইভার তারকই তো সোর্স।"

"আর-একজনকে বাদ দিলি। রনির স্কুলের প্রিন্সিপাল-ম্যাডাম।"

"উনি কেন জানাতে যাবেন?" উত্তেজনায় আঙুল নাচাল টুপুর, "তারকই বলেছে।"

"অত সহজে দুয়ে-দুয়ে চার করিস না। তারকই বা জানবে কী করে যে আমি ডিটেকটিভ? আমাদের ফ্ল্যাটের দরজায়, লেটারবক্সে, কোথাও তো পেশাটা লেখা নেই। রুস্তমজিও নিশ্চয়ই তারককে আমাদের পরিচয় দেননি।"

"তবু... মনে তো হতেই পারে। রনিকে পাওয়া যাচ্ছে না... তারপরই আমাদের ডাকা হল...!"

"ভুল করছিস টুপুর। দু'জন মহিলা, তার মধ্যে একজন স্কুলগার্ল, এদের ঝট করে ডিটেকটিভ বলে ধরা যায় কি?"

"অনুমান তো করাই যায়।"

"উঁহু, খটকাটা থেকেই যাচ্ছে।"

টুপুর চুপ করে গেল। মিতিনও খাচ্ছে নীরবে। পার্থ দু'জনকে ঝলকে দেখে নিয়ে বলল, "এবার আমি দু'-একটা প্রশ্ন করতে পারি?"

"স্বচ্ছন্দে, তবে তাড়াতাড়ি। হাতে কিন্তু বেশি সময় নেই।"

"যশোর রোডের বুথটায় তুমি কখন কল করেছিলে?"

"কাল রাত্তিরেই। রুস্তমজির ফোন আসার মিনিট পনেরো পর।"

"অর্থাৎ অ্যারাউন্ড সাড়ে দশটা? ওপাশে কে ফোন ধরেছিল?"

"একজন মহিলা, নাম নীলিমা বসাক। তাকে আমি জিজ্ঞেসও করেছি, ন'টা কুড়ি থেকে সাড়ে ন'টার মধ্যে কে বা কারা বুথে ফোন করতে এসেছিল। মহিলা জানিয়েছেন, একজনই এসেছিল, সাইকেলে। বয়স বছর চল্লিশ। চেহারা নেহাতই সাদামাটা এবং মহিলা তাকে আগে কখনও দেখেননি।"

"সে যাই হোক, দুটো ফোনকলের ঘটনা কি প্রমাণ করে দিচ্ছে না যে, দুষ্কৃতীরা কাছেপিঠে কোথাও থাকে? অন্তত লেক টাউন থেকে খুব দূরে নয়?"

"হতে পারে।"

"তা হলে তো কেসের সমাধান হয়েই গিয়েছে। এবার অনিশ্চয়দাকে জানিয়ে দাও। গোয়েন্দা বিভাগের আই জি ওই এলাকায় খানাতল্লাশি চালাক। কালো হন্ডা সিটিও বেরিয়ে আসবে, সঙ্গে রনিও।"

"কী সহজ পন্থা!" মিতিন দু'দিকে মাথা নাড়ল, "মাঝখান থেকে রনির প্রাণটা যাক আর কী!"

"আহা, তুমি আর রুস্তমজি দু'জনেই তো নিশ্চিত, ওদের খুনখারাপিতে যাওয়ার মুরোদ নেই!"

"ঠিক কথা। তবে ধরা পড়ার আশঙ্কা প্রবল হলে তারা মরিয়া

হয়ে কী কাণ্ড ঘটাবে তা কি আগে থেকে বলা যায়? সুতরাং ওই ঝুঁকিতে আমি যাবই না।" মিতিন যেন সামান্য দম নিয়ে বলল, "তা ছাড়া ওই ঝুঁকি নিয়ে কোনও লাভও নেই।"

"কেন?"

"ক্রিমিনালরা যথেষ্ট চতুর। আমরা যে দুটো বুথেরই লোকেশন বের করে তাদের ধাওয়া করতে পারি, তারা ভাল মতোই জানে। তবু তারা দুটো কাছাকাছি বুথ থেকে ফোন করছে। সাইকেলও খানিক তফাতে রাখতে পারত, যাতে বুথ-মালিকের চোখে না পড়ে। কিন্তু রাখেনি। কেন? কারণ, তারা চায়, আমরা যেন ধরেই নিই তারা ধারেকাছে থাকে। যেখান থেকে সাইকেলে আসা-যাওয়া করা যায়।"

"তার মানে, রনিকে আরও দূরে কোথাও রেখেছে?"

"অন্তত তুমি যেরকমটা অনুমান করছ, সেরকম কোথাও নেই। ওরা চায়, অন্ধের মতো খুঁজে-খুঁজে আমরা নাকাল হই। ইতিমধ্যে টাকা দেওয়ার সময়টাও চলে আসুক। তখন মুক্তিপণটা নিয়ে, রনিকে ফেলে রেখে তারা চম্পট দেবে।"

পার্থ ভারী নিরাশ হল। গোমড়া স্বরে বলল, "তবে তো ফোনবুথের ক্লু কোনও কাজেই লাগবে না!"

"কিছুই ফ্যালনা নয় স্যার। যদি তাকে ঠিক-ঠিক ইউজ় করা যায়।"

ছোট্ট একটা হাসি ছুড়ে দিয়ে মিতিন ঢুকে গেল স্নানে। পার্থ আর টুপুর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। কী যে ধাঁধায় তাদের ফেলল মিতিন!

রুস্তমজির অফিস একটি বহুতল বাড়ির পঞ্চম তলায়। প্রবেশপথে কাচের দরজা। পেরোলেই রিসেপশন কাউন্টার, সাবেকি পি বি এক্স বোর্ড নিয়ে এক বাঙালি তরুণী সেখানে বিদ্যমান। অফিসটিও বেশ পুরনো ধাঁচের। প্রকাণ্ড ঘরখানায় আধুনিক ধারার কিউবিক্‌ল-টিউবিক্‌ল নেই, ছড়ানো-ছেটানো টেবিলে কাজ করছে জনাতিরিশেক কর্মচারী। কিছু-কিছু টেবিলে কম্পিউটার মজুত।

মিতিন রিসেপশনিস্ট মেয়েটিকে বলল, "আমরা একটু মিস্টার জরিওয়ালার সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"প্রয়োজনটা জানতে পারি?"

"একটা চ্যারিটির ব্যাপারে এসেছি। উনি ডোনেশন দেবেন বলেছিলেন।"

"অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে কি?"

"ইয়েস, এগারোটায়।"

ছোট্ট পি বি এক্স বোর্ডখানার সুইচ নামিয়ে কার সঙ্গে যেন টেলিফোনে কথা বলল মেয়েটি। তারপর ঘাড় হেলিয়ে মিতিনদের বলল, "প্যাসেজ ধরে এগিয়ে যান। মিস্টার জরিওয়ালার চেম্বার একদম শেষে। গিয়ে সেক্রেটারিকে স্লিপ দিন, উনি স্যারের কাছে পাঠাবেন।"

রুস্তমজির ঘরের ঠিক বাইরেটায় তাঁর একান্ত সচিব অশোক মজুমদারের প্রকোষ্ঠ। কাচ দিয়ে ঘেরা। এখানেও টেবিলে কম্পিউটার আর অজস্র কাগজপত্র এবং টেলিফোন।

ল্যান্ডলাইনে কথা বলছিলেন অশোক মজুমদার। বয়স বছর

পঞ্চাশ, মাথায় হালকা টাক, চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। পুরু লেন্সের ওপারে চোখ দুটো কেমন ড্যাবাড্যাবা, নিষ্প্রাণ।

মিতিন-পার্থর সঙ্গে টুপুরের মতো এক কমবয়সি আগন্তুককে দেখেও কোনও জিজ্ঞাসা ফুটল না অশোক মজুমদারের মুখমণ্ডলে। রিসিভারে হাত চেপে বাড়িয়ে দিলেন দর্শনার্থীদের স্লিপ। চটপট ফোনালাপ শেষ করে ঢুকলেন রুস্তমজির রুমে। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই বেরিয়ে ভাবলেশহীন স্বরে বললেন, "যান ভিতরে।"

রুস্তমজির নিজস্ব কক্ষটি ভারী ছিমছাম, সাদামাটা। ধনাঢ্য ব্যবসায়ীসুলভ জাঁকজমক নেই কোথাও, বরং একটু যেন সেকেলে ধরনের। কাঠের আলমারি, স্টিলের ক্যাবিনেট ছাড়া আসবাব বলতে একখানা সেক্রেটারিয়েট টেবিল আর ক'টা চেয়ার। দেওয়ালে দুটো ফোটো ঝুলছে। চোগা চাপকান, টুপিধারী পারসি ভদ্রলোকটি সম্ভবত রুস্তমজির বাবা। অন্যটি এক শ্মশ্রুধারী সন্ন্যাসীর। জরথুস্ত্র।

একটি মোটা কুরসিতে বসে ছিলেন রুস্তমজি। উঠে দাঁড়িয়ে পার্থর সঙ্গে আলাপ করলেন। আসন গ্রহণ করতে বললেন মিতিনদের। বসতে-বসতে টুপুরের মনে হল, আজ যেন কেমন অন্যরকম দেখাচ্ছে রুস্তমজিকে! ও হ্যাঁ, চোখে আজ সোনালি ফ্রেমের চশমা! পরশু তো ছিল না।

মিতিনের মনেও বুঝি একই প্রশ্ন জাগল। জিজ্ঞেস করল, "এটা কি আপনার রিডিং গ্লাস?"

"হ্যাঁ, ম্যাডাম। তবে সামান্য মাইনাস পাওয়ারও আছে।"

"সব সময় পরেন না বুঝি?"

"একেবারেই পরতাম না। ইনফ্যাক্ট, আজ থেকেই শুরু করলাম।" বলতে-বলতে চশমাটা খুলে টেবিলে রাখলেন রুস্তমজি। চোখ কচলে বললেন, "খুব অসুবিধে হচ্ছে। তবে ডাক্তারের হুকুম, সারাক্ষণ চোখে লাগিয়ে রাখতে হবে।"

"প্রথম-প্রথম ওরকম অস্বস্তি হয়। সয়ে যাবে আস্তে-আস্তে।"

"হুম!" রুস্তমজি একটুক্ষণ চুপ। তারপর গলা নামিয়ে বললেন, "তা ম্যাডাম, আপনাদের প্রোগ্রেস কদ্দূর?"

"এগোচ্ছে। কিছু ইন্টারেস্টিং তথ্য পেয়েছি। আপনার টাকার বন্দোবস্ত কমপ্লিট?"

"আজ বিকেলের মধ্যে পুরোটা রেডি হয়ে যাবে।"

"ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড মিস্টার জরিওয়ালা, কীভাবে ব্যবস্থাটা করলেন যদি জানতে পারতাম...!"

কয়েক সেকেন্ড স্থিরদৃষ্টিতে মিতিনকে দেখলেন রুস্তমজি। শুকনো হেসে বললেন, "আপনার প্রশ্নটা আমি বুঝতে পারছি ম্যাডাম। কিন্তু টাকার সোর্স আপনাকে যে বলা সম্ভব নয়। তবে এইটুকু শুনে রাখুন, ব্যবসায়ীদের নানা সময়ে এই ধরনের কাঁচা টাকার প্রয়োজন হয় এবং কোনও প্রশ্ন ছাড়াই সেই টাকা জোগান দেওয়ার লোকও আছে কলকাতায়। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমার এই টাকা জোগাড়ের সংবাদ কাকপক্ষীও জানে না। কীভাবে করছি, কোত্থেকে করছি, কিচ্ছু না। এমনকী, লীলাকেও কথাটা ভাঙিনি। এখন সমস্যা শুধু একটাই। পাঁচশো আর একশো মিলিয়ে তো, টাকার আয়তনটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে।"

পার্থ মাথা দুলিয়ে বলল, "অর্থাৎ ক্যারি করার অসুবিধে, তাই তো?"

"হ্যাঁ, সাহেবজি। কীভাবে নিয়ে যেতে হবে, ঝোলায় না ব্রিফকেসে, এখনও তো জানায়নি। প্লাস আমাকে আমার গাড়িতে যেতে অ্যালাও করবে কি না তাও তো বুঝছি না। যদি পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ইউজ় করতে বলে ট্যাক্সি বা বাস গোছের কিছু, তা হলে হয়তো প্রবলেমে পড়ে যাব।"

"তা বটে। ওভাবে নিয়ে যাওয়ার ঝুঁকিও তো আছে।"

"আমি আর ওসব নিয়ে ভাবতে চাই না, সাহেবজি।" রুস্তমজির মুখখানা ভারী ফ্যাকাশে দেখাল। "সত্যি বলতে কী, ভাবনা করার ক্ষমতাও বুঝি লোপ পাচ্ছে। এবার বড় অসহায় বোধ করছি যেন।"

"স্বাভাবিক। এমন একটা সঙ্কটে পড়েছেন!"

"একটা নয় সাহেবজি, অনেক। নিজের কষ্ট চেপে এক দিকে স্ত্রীকে সামলাচ্ছি, অন্য দিকে বাইরের লোকের সামনে নরমাল থাকতে হচ্ছে, এ যে কী কঠিন! অফিসে আসতে প্রাণ চাইছে না, তবু তো জোর করে আসছি। যাতে আমার অফিসের কেউ কিছু আঁচ না করতে পারে। এই তো, সকালে এক বন্ধু ফোন করেছিল। হেসে-হেসে তার সঙ্গে কথা বলতে হল। এভাবে বুকে পাথর চেপে কি নিশ্বাস নেওয়া যায়?"

"কিন্তু স্যার, রনির মিসিং হওয়ার খবর তো আরও দু'জন জানে। তাদের মাধ্যমে কানাকানি হওয়া তো মোটেই অস্বাভাবিক নয়।"

"আশঙ্কাটা আমার মাথায় ছিল। পরশুই দু'জনকে তাই কড়াভাবে নিষেধ করে দিয়েছি। বলেছি, যদি কেউ সামান্যতম মুখ খোলে, সঙ্গে-সঙ্গে তাকে পুলিশে হ্যান্ডওভার করব।"

"তবু খবরটা কিন্তু চাউর হয়েছে, মিস্টার জরিওয়ালা। না হলে গোয়েন্দা নিয়োগের সমাচারটি ক্রিমিনালদের কানে পৌঁছোল কীভাবে?"

"আমার ধারণা, ওরা আন্দাজে একটা ঢিল মেরেছে। লীলাকে ভয় দেখিয়ে বোধহয় বুঝে নিতে চাইছে, সত্যি-সত্যি আমি কারও সাহায্য নিচ্ছি কি না। কারণ, কাল রাতে যখন ফোনটা করল, তখন কিন্তু আর গোয়েন্দার প্রসঙ্গ তোলেনি।"

"গুড অবজারভেশন," মিতিন এবার নাক গলাল কথোপকথনে। চোখ কুঁচকে বলল, "এমন একটা চাল ক্রিমিনালরা দিতেই পারে।

কারণ, ওরা জানে, আপনার চেয়ে ম্যাডামকে কাবু করা বেশি সহজ।"

"লীলাও কিন্তু ওদের কাছে গোয়েন্দা নিয়োগের কথাটা স্বীকার করেনি। একটাই কথা শুধু বলে গিয়েছে, 'আমি কিছু জানি না। আপনারা আমাকে ছেলে ফিরিয়ে দিন।' "

"আচ্ছা মিস্টার জরিওয়ালা, ওরা কি ম্যাডামকে আর রনির গলা শুনিয়েছিল?"

"না।"

"আপনাকে? কাল রাতে?"

"উঁহু।"

"বোঝা গেল প্রথমবারও ফোনের সময় রনি ধারেকাছে ছিল না। ওরা টেপ করা গলা শুনিয়েছে।"

"বটেই তো।" টুপুর উৎসাহিত স্বরে বলল, "ফোনবুথের ভদ্রলোক তো কোনও বাচ্চার কথা বললেনও না। তা ছাড়া রনি নিশ্চয়ই তখন বুঝে গিয়েছে, সে বাজে লোকের পাল্লায় পড়েছে। সুতরাং তাকে পাবলিক প্লেসে নিয়ে যাওয়া তো সম্ভবই না।"

"একটা কঠিন অঙ্কের সমাধান করলি তো!" মিতিনের ঠোঁটে যেন হালকা বিদ্রূপ। পরক্ষণে হাসি মুছে গলায় প্রশ্ন ফুটল, "আপনি কিন্তু লীলাম্যাডামের কাছে আসা ফোনটার নাম্বার এখনও দেননি, মিস্টার জরিওয়ালা।"

"ও হ্যাঁ, একদম ভুলে গিয়েছি।" রুস্তমজিকে যেন ঈষৎ অপ্রস্তুত দেখাল। পকেট থেকে মোবাইল বের করে বললেন, "এখানে নোট করা আছে, লিখে নিন। তবে এটাও একটা পাবলিক বুথেরই নাম্বার। আমি ডায়াল করে দেখেছি।"

কথাবার্তার মাঝেই দরজায় অশোক মজুমদারের কণ্ঠ, "আসতে পারি স্যার?"

"কী ব্যাপার?"

"জামশেদপুর ডিলারের একটা চালান সই করানোর ছিল। আজই জিনিস পাঠাতে হবে।"

"আপনিই তো সই মেরে দিতে পারতেন, অশোকবাবু।"

"তবু নতুন পার্টি তো স্যার, আপনি যদি একবার...!" বলতে-বলতে চালানের বইটি রুস্তমজির টেবিলে রাখলেন অশোক মজুমদার। ঝুঁকে কাগজটায় চোখ বোলাচ্ছেন রুস্তমজি, ফের অশোকের গলা, "চশমাটা পরে নিন স্যার।"

"সরি। অভ্যেস হয়নি তো, খেয়াল থাকছে না।" রুস্তমজি ফের চশমা চড়ালেন। সই করতে-করতে বললেন, "ফ্রেমটা কিন্তু অ্যাডজাস্ট করতে হবে। কানে লাগছে।"

"আমি তো আপনাকে বলেছিলাম স্যার, কোনও বড় দোকান থেকে করান। আপনি শুনলেন না।"

"বউবাজারে ওই চশমার দোকানটার সঙ্গে আমাদের কত বছরের সম্পর্ক বলুন তো! বাবা-মা দু'জনেই ওদের কাস্টমার। ছোট থেকে দেখছি, বউবাজারের মেটকাফ স্ট্রিটে আমাদের পবিত্র অগ্নিমন্দিরে গেলে বাবা একবার অন্তত 'দাস অ্যান্ড কোম্পানি'-র দোকানে ঢুকবেনই। ঐতিহ্যটা কি হুট করে ভাঙা যায়?"

কথাটা যেন অশোক মজুমদারের পছন্দ হল না। বিরস মুখে বললেন, "তা হলে আর কী! কষ্ট করে পরুন ক'দিন। নেক্সট যেদিন মন্দিরে যাবেন, দেখিয়ে নেবেন।"

"আজ আপনার মুড অফ মনে হচ্ছে?" রুস্তমজি টিপ্পনী কাটলেন, "হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাচ্ছেন বুঝি?"

"আমার প্র্যাকটিস আছে স্যার। মিসেস তো প্রায়ই ছেলেমেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ি যায়।"

"এবার তারা ফিরছে কবে?"

"রবিবারের আগে নয়।"

"এ ক'দিন হোম ডেলিভারি আনিয়ে নিন। মেজাজ শরিফ থাকবে।"

প্রসঙ্গটায় যেন অস্বস্তি বোধ করছিলেন অশোকবাবু। আস্তে-আস্তে বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে।

রুস্তমজির ঠোঁটে একফালি হাসি, "দেখেছেন তো, কী সিরিয়াস টাইপ! তবে আমার ভালমন্দের দিকে কিন্তু খুব নজর। পুরনো লোক তো, প্রায় আত্মীয়ের মতো হয়ে গিয়েছেন।"

"সেরকমই তো মনে হল," মিতিনও মৃদু হাসল। "এখানে কতদিন চাকরি করছেন?"

"বছর কুড়ি। যবে থেকে কার্পেটের বিজনেসটা টেকআপ করেছি, প্রায় তখন থেকে।"

"ও।"

মিতিন আর প্রশ্নে গেল না। ঠান্ডা মাথায় চমৎকার সাজিয়ে-গুছিয়ে পেশ করল গতকালের কার্যবিবরণী। কে জানে কেন, ভাড়ার গাড়ির বিষয়টা এড়িয়ে গেল কায়দা করে। এর পর কালপ্রিটদের ফোন এলে রুস্তমজিকে কী কী জেনে নিতে হবে, তাও শেখাল ভালভাবে।

নীচে নেমে সোজা পার্কিং-লট। রুস্তমজির বি এম ডব্লিউ গাড়ির জানলায় তারক সিটে ঢুলছিল। তাকে ডেকে তুলল।

মিতিনদের দেখে তারক হতচকিত। মাথায় টুপিটি চড়িয়ে বেরিয়ে এল তাড়াতাড়ি। শশব্যস্ত মুখে বলল, "ইয়েস ম্যাডাম!"

মিতিন সরু চোখে বলল, "আপনি নিশ্চয়ই জানেন আমি কে?"

"আজ্ঞে... মানে...!" মিতিনের চোখে চোখ রেখেও তারক দৃষ্টি নামিয়ে নিল, "আপনাকে তো ঢাকুরিয়া থেকে আনলাম।"

"কেন আপনার মনিবের বাড়ি গিয়েছিলাম বলুন তো?"

চমকে তাকিয়েও তারক ফের নতমস্তক। নিরুত্তর। নখ খুঁটছে।

মিতিনের স্বর সামান্য কঠোর হল, "বুঝতে পারছেন কী, আমি খুব সুবিধের লোক নই? এখন যা যা জানতে চাইব আশা করি জবাব মিলবে?"

"বলুন?"

"পরশুদিন ঠিক ক'টায় রনির স্কুলে পৌঁছেছিলেন?"

"বিকেলে?"

"নয়তো কি সকালের কথা বলছি? কখন আপনি বাচ্চাটাকে আনতে গিয়েছিলেন?"

"যেমন যাই, তিনটেয়।"

"উঁহু, মিথ্যে বলবেন না।"

"দু'-পাঁচ মিনিট হয়তো লেট হয়েছিল।"

"বাজে কথা। আপনি সাড়ে তিনটের আগে পৌঁছোননি।"

"হতেও পারে। ঘড়ি দেখিনি।"

"কবজিতে রিস্টওয়াচ, তাও দেখেননি?"

তারক উত্তর দিল না। গোঁজ মেরে রইল।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিয়ে মিতিন গলা একধাপ চড়াল, "আপনার দেরির কারণেই কিন্তু রনি নিখোঁজ হল। অর্থাৎ রনি হারিয়ে যাওয়ার জন্য আপনি কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে দায়ী।"

"ও, স্যারের ছেলে হারানোর কেসে আপনি আমাকে জড়িয়ে দিতে চাইছেন?" নার্ভাস তারক হঠাৎই তেরিয়া। মুখ-চোখ আমূল বদলে গেল। আঙুল নেড়ে বলল, "কৈফিয়ত আমার তৈরি আছে ম্যাডাম। পরশু সাহেবের কাজ করতে গিয়েই আমার দেরি হয়েছিল।"

"কী কাজ?"

"সাহেবের চশমা ডেলিভারি নেওয়ার ছিল বউবাজার থেকে।

খামোকা দোকানে আমাকে বসিয়ে রাখল। তিনটের আগে নাকি ওদের কারখানা থেকে জিনিস আসে না। সেই চশমা নিয়ে যেতে-যেতে আমার তো দেরি হতেই পারে।"

"আগে রনিকে তুলে নিয়ে চশমার দোকানে যাননি কেন?"

"তখন কি জানতাম, একদিন লেট হলে রনি হাপিস হয়ে যাবে?"

পার্থ ফস করে বলে উঠল, "আপনি যে সত্যি-সত্যি বউবাজারে আটকে গিয়েছিলেন, এটা প্রমাণ করতে পারবেন?"

"সাক্ষীসাবুদ রাখতে হবে এমনটা তো ভাবিনি। তবু খোঁজ করে দেখতে পারেন।" তারক গজগজ করল, "মনে যদি কু মতলব থাকত, কবেই তো রনিকে গায়েব করতে পারতাম।"

মিতিন যেন শুনেও শুনল না। জিজ্ঞেস করল, "রনির আই-ডি কার্ড তো গাড়িতেই থাকে, তাই না?"

"হ্যাঁ, ড্যাশবোর্ডে রাখা ছিল। এখন ম্যাডামের কাছে।" তারকের স্বর ধীরে ধীরে নরম হল। ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, "রনির এখনও কোনও খোঁজ পাননি, না?"

উত্তর না দিয়ে মিতিন বলল, "আপনি ক'দ্দিন মিস্টার জরিওয়ালার গাড়ি চালাচ্ছেন?"

"প্রায় তিন বছর। বি এম ডব্লিউটা কেনার আগে থেকে। তখন সাহেবের ফোর্ড গাড়িটা চালাতাম।"

"আর রাকেশ কতদিন কাজ করছেন?"

"আমার চেয়ে অনেক কম, বছরখানেক।"

"রনির সঙ্গে কার বেশি ভাব, আপনার না, রাকেশের?"

"অবশ্যই আমার। গাড়িতে সারাক্ষণ আমার সঙ্গে বকবক করে। কোন ভিডিয়ো গেমস কীভাবে খেলতে হয়, স্কুলে ক্রিকেটম্যাচে ও কত রান করেছে, কোন সিনেমাটা ভয়ের, কোনটা হাসির, সব

আমাকে বলা চাই। যথেষ্ট চালাক-চতুর ছেলে। ওকে যে কেউ ভুলিয়েভালিয়ে তুলে নেবে, ভাবতেও পারিনি।"

"হুম, তা রাকেশ কেমন?"

"এমনিতে মন্দ নয়। তবে ভীষণ ফাঁকিবাজ। ঘনঘন ডুব মারে। মেমসাহেব নিজেও গাড়ি চালান তো, সেইজন্য ওর আরও সুবিধে।"

"সাহেব নিজে চালান না গাড়ি?"

"খুব কম। ক্বচিৎ-কখনও হয়তো কোনও পার্টিতে গেলে আমায় তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেন। তখনই যা...!"

"আচ্ছা, রাকেশ কি মিছে কথা বলে ছুটি নেন?"

"সেটা তো বলতে পারব না। তবে ফাঁকিবাজদের তো একটু গপ্পো বানানোর অভ্যেস থাকে।"

"দেশে যাওয়ার নাম করে কলকাতায় বসে নেই তো?"

"কে জানে?" বলেই তারকের চোখ সরু, "কেন বলুন তো? রাকেশকেও কি আপনি সন্দেহ করছেন?"

"বাদ দেওয়ারও তো কারণ দেখি না। কাজটা তো কারও একার নয়, বেশ শলাপরামর্শ করেই হয়েছে।"

"মানে?" কথায়-কথায় খানিক সহজ হল তারক, আবার আড়ষ্ট রীতিমতো। হাতজোড় করে বলল, "দয়া করে আমাকে এর মধ্যে টানবেন না ম্যাডাম। আমি কিন্তু সত্যিই কিছু জানি না। এমনই কপাল, একদিন যেতে লেট হল, আর সেদিনই সর্বনাশটা ঘটল?" সাহেব-মেমসাহেবের দিকে আমি চোখ তুলে তাকাতে পারছি না পর্যন্ত। কী মনোকষ্টে যে ভুগছি, সেটা যদি জানতেন!"

"কিন্তু আমার যে কয়েকটা খটকা থেকে যাচ্ছে তারকবাবু।" মিতিন চোখ নাচাল, "কাইন্ডলি সেগুলো একটু ক্লিয়ার করবেন?"

"কী কী খটকা?"

"সেদিন ম্যাডামকে তো স্কুল থেকে আগে সাহেবের অফিসে নিয়ে আসা উচিত ছিল। অথচ আপনি ম্যাডামকে বাড়ি ফেরার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কেন?"

"এরকম বলেছি? কই, মনে তো পড়ছে না।"

"তারপর ধরুন, আপনি সাহেবের কাজেই গিয়েছিলেন এবং তার জন্য আপনার দেরি হয়েছে। অথচ কথাটা আপনি সাহেব-মেমসাহেবকে জানাননি। কেন?"

"বিশ্বাস করুন, আমার কোনও খারাপ উদ্দেশ্য ছিল না। ওঁরা যা নার্ভাস ছিলেন, তখন যদি কথাটা বলি, ওঁরা হয়তো আমাকেই...! তাই ভয় পেয়ে...!"

"হুম।" মিতিন আগাপাশতলা দেখল তারককে। তারপর হঠাৎই প্রশ্ন হানল, "আমাদের চৌরঙ্গিতে আনার সময় আপনার মোবাইলে পরপর দুটো কল এসেছিল। কার-কার?"

"একটা আমার বাড়ি থেকে, দিদির ফোন। তাড়াতাড়ি ফিরব বলেছিলাম। দেরি দেখে ফোন করছিল। দ্বিতীয় ফোনটা মজুমদারসাহেবের। জানতে চাইছিলেন, স্যারের চশমা পেয়েছি কি না।"

"হুম!" মিতিন চোখ ঈষৎ তেরচা করল, "আচ্ছা তারকবাবু, রনিকে আনতে যাওয়ার সময় কখনও কাউকে সঙ্গে নিতেন কি? মানে অফিসের কেউ?"

"ওরে বাবা, স্যারের গাড়িতে যাকে-তাকে তুলব? একবার সুজয়বাবুকে গাড়িতে উঠিয়ে যা বকুনি খেয়েছিলাম!"

"কে সুজয়বাবু?"

"মজুমদারসাহেবের ছোট ভাই। ক্যাশে কাজ করতেন।"

"এখন নেই?"

"ছেড়ে দিয়েছেন।" তারক একটু দম নিল, "একবার মজুমদার সাহেবের জ্বর। অফিসে আসছিলেন না। তখন স্যার আমাকে

ওঁর সল্টলেকের বাড়িতে একটা ফাইল আনতে পাঠিয়েছিলেন। ওদিকের রাস্তাঘাট তো তেমন চিনি না, ভেবেছিলাম সুজয়বাবু তো ওই বাড়িতেই থাকেন, ওঁকে সঙ্গে নিলে সুবিধে হবে। কিন্তু ভাইকে সাহেবের গাড়িতে দেখে মজুমদারসাহেবের সেদিন কী চোটপাট! সেই থেকে স্যার-ম্যাডাম না বললে কাউকে গাড়িতে ওঠাই না।"

"মজুমদারসাহেবকেও নয়?"

"উনি এ গাড়ি চড়েন না। তা ছাড়া তাঁর তো নিজের গাড়ি আছে, সানত্রো।"

মিতিন এদিক-ওদিক চোখ চালিয়ে বলল, "কোন গাড়িটা?"

"এখন ক'দিন আনছেন না। ব্রেকের কী গন্ডগোল হয়েছে, সারাতে দিয়েছেন।"

"ও!" মিতিন ঠোঁট সামান্য সুচলো করল, "চশমাটা কি পরশুই সাহেবকে দিয়েছিলেন?"

"না ম্যাডাম। ওই ঘটনার পর মাথাতেই ছিল না। কাল বিকেলে ফেরার পথে মনে পড়ল, তক্ষুনি দিয়ে দিয়েছি।"

তারককে আর কোনও জেরায় গেল না মিতিন। একটুক্ষণ ভাবল কী যেন। তারপর অন্যমনস্ক পায়ে হাঁটা লাগাল নিজেদের গাড়ির দিকে।

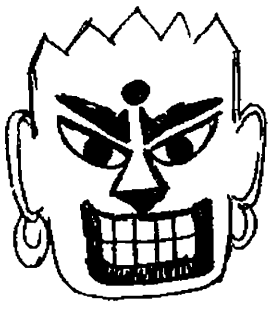

দুপুর বারোটা। ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর। দোকানিরা খাবার সাজাচ্ছে ক্যামাক স্ট্রিটের ফুটপাথে। বিরিয়ানি থেকে ঝালমুড়ি, কী আছে আর কী নেই! অফিসবাবুদের টিফিন। গাড়ি চালাতে-চালাতে পার্থর

সেদিকেই নজর। লোভী-লোভী গলায় বলল, "এখন নিশ্চয়ই আমাদের লাঞ্চব্রেক?"

"হ্যাঁ স্যার। পেট পুরে খেয়ে নাও। তোমাদের এখন টানা পাঁচ ঘণ্টা ছুটি।"

"কেন? কেন? কেন?"

"অবনীদা এস এম এস পাঠিয়েছেন। মিস্টার দস্তুরের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে বিকেল ছ'টায়। ময়দানে, পারসি ক্লাবে। ততক্ষণ তোমরা খাও আর চরকি কাটো। আমি কয়েকটা কাজ সেরে আসি।"

টুপুর, পার্থকে কোনও প্রশ্নের সুযোগই দিল না মিতিন। তাড়া লাগিয়ে নামিয়ে দিল কাছের শপিং মলটায়। নিজে ড্রাইভিং সিট দখল করে বলল, "বাইই, ঠিক সময়ে তোমাদের ডেকে নেব।"

নিমেষে লাল মারুতি হাওয়া। পার্থ হাত উলটে বলল, "আর কী, চল আমরা আমাদের প্রোগ্রামটা ছকি। পাঁচ ঘণ্টা তো মেলা সময়, কী করে যে কাটবে!"

"আমরা আইনক্সে একটা পিকচার দেখতে পারি।"

"গ্র্যান্ড আইডিয়া। তার আগে কিছু সাঁটাই চল।"

ফুডকোর্টটি বাজারের চার তলায়। চিনা, জাপানি, কন্টিনেন্টাল, মোগলাই, হরেক খানার ছড়াছড়ি। দু'খানা পুরুষ্টু পিৎজা আর ব্রাউনি নিয়ে গুছিয়ে বসল পার্থ। পিৎজা থেকে খানিকটা চিজ চেঁচে নিয়ে মুখে পুরে বলল, "তোর মাসিটা গেল কোথায় বল তো?"

টুপুরও আন্দাজ করার চেষ্টা করছিল। উঁহু, মগজ খেলছে না। ঠোঁট উলটে বলল, "কে জানে!"

"ফালতু ছুটে মরছে। ওই তারককে আর-একটু কড়কালেই সব হুড়হুড় বেরিয়ে পড়ত।"

"কাজটা তা হলে তারকেরই বলছ?"

"সন্দেহ আছে কোনও? চশমার দোকানটা তো ওর অ্যালিবাই। ব্যাটা জেনেশুনেই দেরিতে গিয়েছে। যাতে রনি নির্বিবাদে লোপাট হয়।"

"অর্থাৎ তারকের একটা গ্যাং আছে।"

"অথবা তারক গ্যাং-এ আছে। গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, রনির আই-ডি কার্ডটা তারকই সাপ্লাই দিয়েছে। কার্যসিদ্ধি হতেই কার্ডটা ফের ব্যাক টু তারক।"

"কীভাবে?"

"গোটা ঘটনাটা আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। রনিকে গাড়িতে তুলে ক্লোরোফর্ম শোঁকানো হল। ব্যস, রনি অজ্ঞান। তারপর নির্দিষ্ট জায়গায় গাড়ি নিয়ে একটু অপেক্ষা। ওদিকে তারকও সময় মেপে বেরোল চশমার দোকান থেকে এবং পথে আই-ডি কার্ডটা কালেক্ট করে নিল। তারকের এগেনস্টে আর কোনও প্রমাণ রইল না।"

"কিন্তু চেনা লোকটি কে? যাকে দেখে রনি অবলীলায় উঠে পড়ল গাড়িতে?"

"পুলিশের রুলের গুঁতো খেলে ওটাও উগরে দেবে তারক। তোর মাসি কেন যে এক্ষুনি ব্যাটাকে গারদে ঢোকাল না!"

"আমারও খুব অবাক লাগল, জানো। তারককে কেমন হেলায় ছেড়ে দিল মিতিনমাসি।"

"কোনও একটা প্ল্যান নিশ্চয়ই ভাঁজছে।"

গবেষণার মাঝেই উঠে গিয়ে ঠান্ডা পানীয় নিয়ে এল পার্থ। আহারপর্ব সেরে দৌড়োল সিনেমা হলে। বেছেবুছে একটা ইংরেজি সিনেমায় ঢুকল। দারুণ মজার ছবি। একের পর-এক উদ্ভট কাণ্ড ঘটছে, হো হো, হি হি হাসছে পার্থ-টুপুর। হাসির জোয়ারে অপহরণ কাণ্ডটি প্রায় মাথা থেকে উধাও।

শো ভাঙল সাড়ে তিনটেয়। এবার কী করে? ঘুরে-ঘুরে খানিকক্ষণ

উইন্ডো শপিং করল দু'জনে। তারপর ঢুকল বইয়ের দোকানে। পার্থ পছন্দ করল দাবা খেলার একটি বই, টুপুর নিল দু'খানা আগাথা ক্রিস্টি। কাউন্টারে বিল মেটাচ্ছে পার্থ, তখনই মিতিনের মিস্‌ড কল।

দুদ্দাড়িয়ে শপিং মলের গেটে এসে টুপুর থ'। গাড়িতে মিতিনমাসির পাশে বাবা!

মিতিন মুচকি হেসে বলল, "অবনীদাকে তুলে আনলাম, বুঝলি। পারসি বন্ধু আছে অবনীদার, অথচ ময়দানে পারসি ক্লাবটা কখনও দেখেননি!"

"কোনও উপলক্ষ ঘটেনি যে।" হাই মাইনাস পাওয়ার চশমার ওপারে অবনীর চোখ চকচক, "আমি কিন্তু আজ দারুণ থ্রিল্‌ড। এই প্রথম কোনও কেসে তোমার কাজে লাগছি।"

"দয়া করে মিস্টার দস্তুরের সামনে উচ্ছ্বাসটা প্রকাশ করবেন না। আমার পরিচয় নিয়েও আড়ম্বরের কোনও প্রয়োজন নেই।"

"কিন্তু আমি যে বলে ফেলেছি তুমি গোয়েন্দা?"

"তাতে ক্ষতি নেই। শুধু কী কেস করছি না জানলেই ভাল।"

"কেসটা যে কী, আমাকেও তো খুলে বলোনি মিতিন।"

"আপাতত নয়, রহস্যজালেই মোড়া থাক।"

"যা তোমার অভিরুচি। তুমি তো বরাবরই রহস্যময়ী।"

শ্যালিকা-জামাইবাবুর রঙ্গরসিকতার মাঝেই স্টার্ট দিল গাড়ি। মিতিনই স্টিয়ারিং-এ। জওহরলাল নেহরু রোড বেয়ে পেরোল পার্ক স্ট্রিটের মোড়। বাঁয়ে মেয়ো রোড ধরল। খানিক এগিয়ে পাশাপাশি দু'খানা ক্লাবের তাঁবু। মাঝখানটা চিরে সরু পথ, পারসি ক্লাবে পৌঁছোনোর রাস্তা।

টেন্টের গেটে থামল গাড়ি। নেমেই মনটা যেন ভরে গেল টুপুরের। চারপাশ কী সবুজ। কংক্রিটের এই শহরে ময়দানটা যেন

সত্যিই মরূদ্যান। নাগরিক কোলাহল নেই, পাখির ডাক শোনা যায়, নরম হাওয়ায় জুড়িয়ে আসে শরীর। অদূরে রেড রোড ধরে হু হু গাড়ি ছুটছে, অথচ তাদের যান্ত্রিক শব্দ পৌঁছোচ্ছে না এখানে। প্রশস্ত রাজপথের দু'ধারে কৃষ্ণচূড়া-রাধাচূড়া-গুলমোহরের মিছিল। লাল-হলুদ-বেগুনি ফুলে ছেয়ে আছে গাছগুলো। পড়ন্ত সূর্যের আলোয় কী অপরূপ যে লাগছে!

ক্লাবের অন্দরেও প্রচুর গাছগাছালি। আম, জাম, পামট্রি। বেড়ার ধারে গন্ধরাজ গাছটা তো ফুলে-ফুলে সাদা হয়ে আছে। আঃ, কী মিষ্টি গন্ধ!

গাড়ির আওয়াজ পেয়েই বেরিয়ে এসেছিলেন প্রোফেসর রতন দস্তুর। অবনীরই মতো মধ্যবয়সি। গায়ের রং টকটকে লাল, খাড়া নাক, ব্যাকব্রাশ চুল, লম্বা-চওড়া মানুষটার দেহে জিন্‌স-টি-শার্ট। ভারী আন্তরিক ভঙ্গিতে জড়িয়ে ধরলেন অবনীকে। ঝড়ের গতিতে সেরে ফেললেন আলাপ-পরিচয় পর্ব। লতানো গাছের তোরণ পেরিয়ে সবাইকে এনে বসালেন লনটায়।

জনাকয়েক পারসি মহিলা-পুরুষ রয়েছেন সবুজ লনে ইতিউতি ছড়ানো চেয়ার-টেবিলে। তাঁবুর পিছনে, ঘেরা মাঠে ফুটবল খেলছে কচিকাঁচারা। সম্ভবত বাবা-মা'র সঙ্গে এসেছে। তাদের সরু গলায় উল্লাস শুনতে বেশ লাগছে।

টুপুরের মতো মিতিন-পার্থও চারদিকটা দেখছিল। প্রশংসার সুরে পার্থ বলল, "জায়গাটা ভারী সুন্দর তো! কতটা স্পেস! বাস্কেট বলের কোর্ট রয়েছে, ক্রিকেট পিচ।"

"শুধু খেলার লোকই যা কমে গিয়েছে।" রতন দস্তুর আলতো হাসলেন, "একসময় ক্লাবটা কী জমজমাট ছিল, ভাবতে পারবেন না। আমাদের ছেলেবেলায় তো বিকেলে লনটা গিজগিজ করত। এখন আর ক'জনই বা আসে!"

পার্থ তাঁবুটার দিকে আঙুল দেখাল, "আপনাদের টেন্টটাও কিন্তু বেশ পুরনো হয়ে গিয়েছে।"

"ওটাকে বলে অ্যান্টিক লুক।" রতন চোখ টিপলেন, "উনিশশো আটে তৈরি হয়েছিল ক্লাব। গোটা পূর্ব ভারতে এটাই ছিল আমাদের সবচেয়ে খানদানি আড্ডা। সেঞ্চুরি পেরিয়েছে তো, তাই এখন প্রাচীনত্বের গরিমা ঠিকরে বেরোচ্ছে।"

"সারালে কিন্তু বেশ ঝকঝকে লাগবে।"

"দরকার কী, দিব্যি তো চলছে," রতনের হাসি চওড়া হল, "আসলে ব্যাপারটা কী জানেন? আমরা পারসিরা, একটু রক্ষণশীল। দুমদাম কিছু বদলে ফেলা আমাদের ধাতে নেই। এই তো দেখুন না, সেই কত বছর আগে পারস্যদেশ ছেড়েছি। অথচ সেখানকার অজস্র রীতিনীতি আজও আঁকড়ে ধরে বসে আছি। আমাদের অগ্নিমন্দিরে এখনও পারসি ছাড়া কেউ ঢুকতে পারে না। পারসি সম্প্রদায়ের বাইরে আমাদের বিয়ে-থা'র চল নেই বিশেষ। যদি বা হয়, পারসি সমাজ মোটেই সেটাকে ভাল চোখে দেখে না।"

"আজকালকার দিনেও অত মানামানি চলে?"

"চলছে তো, চলে আসছে। এভাবেই তো আমরা বেশ টিকে আছি।" বলেই হাতের ইশারায় ক্লাবের বেয়ারাটিকে ডাকলেন রতন। কফি আর চিকেন পকোড়ার অর্ডার দিয়ে সোজা হয়ে বসলেন। মিতিনকে বললেন, "ইয়েস ম্যাডাম, আর আপনাকে বোর করব না। এবার কাজের কথাটা শুনি।"

মিতিন হেসে বলল, "অবনীদা বললেন, আপনি নাকি টানা আট বছর পারসি ক্লাবের সেক্রেটারি ছিলেন? তা হলে তো নিশ্চয়ই অনেককেই চেনেন?"

"বলতে পারেন। ক্লাবের শতকরা পঁচানব্বই জনকে তো বটেই।

তবে ক্লাবের সেক্রেটারি হওয়ার সূত্রে নয়। আমার একটা অন্য পরিচয়ও আছে।"

"কীরকম?"

"আমরা, দস্তুররা হলাম পুরোহিতের বংশ। পারসি সমাজে পুরোহিতের তেমন কোনও ভূমিকা নেই। তবু নানান কাজেকর্মে আমাদের ডাক তো পড়েই। যেমন ধরুন, বিয়ে-শাদি দেওয়া...!"

অবনী বলে উঠলেন, "তুমি বিয়ে দাও নাকি?"

"না না, আমি ওসবে নেই। তবে আমার দাদা এখন কলকাতার একমাত্র মোবেদ। শুধু বিয়ে দিতে নয়, দাদাকে সব আচার-অনুষ্ঠানেই যেতে হয়। দাদার সুবাদে আমারও সবার সঙ্গে জানাশোনা।"

"ও!" মিতিন একটু দম নিয়ে বলল, "আমি কলকাতার একজন বিশিষ্ট পারসি ভদ্রলোক সম্পর্কে কিছু জানতে চাই।"

"কে বলুন তো?"

"শেঠ রুস্তমজি জরিওয়ালা।"

"রাস্টি, রাস্টি?" রতন দস্তুর বেজায় অবাক, "তার আবার কী হল?"

"কিছু মনে করবেন না মিস্টার দস্তুর, আমার তদন্তের বিষয়টি অত্যন্ত গোপনীয়। শুধু এটুকু বলতে পারি, রুস্তমজির অসম্মান হতে পারে এমন কিছু আমি খুঁজছি না।"

"ও, তা কী জানতে চান?"

"রুস্তমজি মানুষটি কেমন?"

"এক কথায় বললে, এক্সেলেন্ট। আমাদের কলকাতার পারসি সমাজের গর্ব। প্রাণে দয়ামায়া আছে, প্রচুর দান-ধ্যান করে, অফিসেও মালিক হিসেবে খুব সুনাম। বাড়ির যে-কোনও অনুষ্ঠানে অফিসের বেয়ারাটিকে পর্যন্ত নেমন্তন্ন করে। তবে একটু মাথা গরম টাইপ। বিশেষত, কেউ বেইমানি করলে রাস্টি ছেড়ে কথা বলে

না। শুধু এই কারণেই মুম্বইয়ের তিন-তিনটে রইস ডিলারকে ছাঁটাই করেছে। তারা নাকি লুকিয়ে অন্য কোম্পানির জিনিস বেচছিল। এই তো, মাস চারেক আগে অফিসেও একজনের চাকরি নট করল। লোকটা নাকি ভাউচার জাল করে টাকা তুলত। শুনেছি, লোকটা ওর খুব রিলায়েবল স্টাফের রিলেটিভ। সে নাকি রাস্টির হাতে-পায়েও ধরেছিল, তবু তাকে ক্ষমা করেনি। শুধু তাই নয়, রাস্টি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, আর কোনও অফিস-স্টাফের আত্মীয়কে চাকরি দেবে না।"

অবনী বললেন, "ওরে বাবা, তুমি দেখছি ভদ্রলোকের নাড়িনক্ষত্র জানো!"

"আমি তো ওকে প্রায় জন্ম থেকেই চিনি। ওর বিয়েটাও তো দিয়েছে আমার দাদা। রাস্টির বউ লীলাও আমার খুব চেনা। আমার ছোট বোনের বান্ধবী।"

মিতিন বলল, "তা হলে তো আপনি মিস্টার জরিওয়ালার আত্মীয়স্বজনের গল্পও বলতে পারবেন!"

"আত্মীয় আর রাস্টির কে আছে তেমন! ছিলেন এক পিসি, তিনি তো বহু বছর যাবৎ অস্ট্রেলিয়ায় সেটেল্‌ড। তাঁর ছেলেমেয়েরা কস্মিনকালে কলকাতায় আসে না। রাস্টির 'আপন বলতে তো এখন বাবা, মা আর ভাই। ওই ভাইয়ের সঙ্গে অবশ্য রাস্টির একটু খিটিমিটি বেধেছে।"

"কী নিয়ে?"

"ব্যাবসাপত্তর। জিমিই ঝঞ্ঝাট পাকাচ্ছে। তার জাহাজের ব্যাবসায় নাকি মন্দা চলছে ইদানীং। তাই দাদার কার্পেটের বিজনেসে ঢুকতে চায়। রাস্টির বাবাও নাকি জিমির দলে। তাই নিয়ে খানিক মন কষাকষি চলছে শুনেছি।"

"তার মানে ভাইয়ে-ভাইয়ে বিবাদ?" পার্থর কপালে ভাঁজ

পড়ল, "আচ্ছা মিস্টার দস্তুর, রুস্তমজির ভাই কি খুব হার্মফুল? আই মিন, প্রতিশোধপরায়ণ?"

"এটা তো বলতে পারব না। জিমি তো আমার চেয়ে অনেকটাই ছোট, নেচারটা তাই খুব ভাল জানা নেই।"

"ও! তা মিস্টার জিমি কি কলকাতায় আসা-যাওয়া করেন?"

"আসে বোধহয়। কলকাতায় তো ওর একটা ফ্ল্যাটও আছে।"

"কোথায়?"

"এলিয়ট রোডে।"

"ওনারশিপ?"

"তাই তো শুনেছি। সম্ভবত সেকেন্ড হ্যান্ড।" রতন দস্তুর এতক্ষণে যেন থমকালেন, "এত সংবাদ জানতে চাইছেন কেন? জিমি কি কিছু ঘটিয়েছে?"

"না না। মিতিন জোরে-জোরে মাথা নাড়ল, "রুস্তমজি একটা বাজে বিপদে পড়েছেন। আমি জাস্ট তার কারণটা বের করতে চাইছি। যাক গে, আবার একটু পারসি সমাজের গল্প বলুন। আপনাদের একটা নিউজ পেপার বেরোয় না কলকাতা থেকে?"

"উঁহুঁ, হাউস জার্নাল। দু'খানা। 'গাবাসনি', আর 'আওয়ার ভেঞ্চার'। কলকাতার পারসিদেরই নানান সমাচার থাকে জার্নালে।"

খাবার এসে গেল। চলছে হাত-মুখ, সঙ্গে কথাও। পারসিদের ধর্মগ্রন্থ 'আভেস্তা' সম্পর্কে অনেক তথ্য দিলেন রতন দস্তুর। শোনালেন জরথুস্ত্রের বাণী। একটি উপদেশ তো ভারী পছন্দ হল টুপুরের। দারিদ্র্য আর ভিক্ষে করাকে নাকি পারসিধর্মে খুব নিন্দনীয় বলে ধরা হয়।"

গল্পগাছা সাঙ্গ হল প্রায় সন্ধে সাড়ে সাতটায়। অবনী উত্তেজনায় হাঁসফাঁস করছিলেন, গাড়িতে উঠেই জিজ্ঞেস করলেন, "কী মিতিন, কাজ কিছু হল?"

মিতিন বলল, "আমি তো কাজে যাইনি। কাটাকুটি খেলতে গিয়েছিলাম।"

"বুঝলাম না!"

"এক্ষুনি বোঝার দরকার কী অবনীদা? মেট্রো স্টেশনে নেমে সোজা বাড়ি চলে যান। শুধু দিদিকে গিয়ে বলবেন, আপনার দৌলতেই কেস সল্‌ভ হতে চলেছে।"

অবনী ফ্যালফ্যাল করে তাকালেন, "এটাও বুঝলাম না।"

মিতিন আর কথায় গেল না, গাড়ি চালাচ্ছে চুপচাপ। বাড়ি ফিরে সোজা ঢুকে গেল নিজের স্টাডিতে। খাওয়ার আগে আর বেরোলই না। ডাইনিং টেবিলেও বড় অন্যমনস্ক। রুটি ছিঁড়ছে, মুখে পুরছে, চিবোচ্ছে, তবু কোনও ক্রিয়াতেই যেন মন নেই।"

আহার সেরে মিতিন সবে আঁচাচ্ছিল, তখনই বেজে উঠল মোবাইল। যেন এই ফোনটারই প্রতীক্ষায় ছিল এভাবে দৌড়ে গিয়ে তুলল। কানে চেপে শুনল প্রথমটা, তারপর অস্ফুটে বলল কী যেন। তারপর ফোন অফ করে দাঁড়িয়ে রইল নিথর।

টুপুর ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করল, "কার ফোন ছিল গো, রুস্তমজির?"

"হুঁ!" মিতিনের ঠোঁট নড়ল, "ক্রিমিনালরা টাকা দেওয়ার সময়টা এগিয়ে এনেছে। কাল ভোর পাঁচটায় কিট্‌সব্যাগে ভরে পৌঁছে দিতে হবে মুক্তিপণ এবং রুস্তমজিকে যেতে হবে একা। নিজে গাড়ি ড্রাইভ করে।"

"কোথায়?"

"বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে। সঠিক লোকেশন কাল ভোরে বলবে।"

"ও। আমরা তা হলে এখন কী করব?"

"ওরা চলে ডালে-ডালে, মিতিন চলে পাতায়-পাতায়। যা, তোরা

শুয়ে পড়। ঠিক রাত তিনটেয় ডাকব।" বিদ্যুদ্‌বেগে মিতিন ফের স্টাডিতে, মোবাইল ফোন হাতে নিয়ে। বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

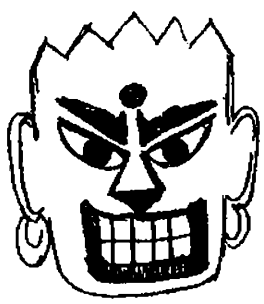

ভোরের আলো ফুটছে সবে। পৃথিবীতে এখন এক তরল আবছায়া, পশ্চিম আকাশে ঝুলে আছে ফ্যাকাশে চাঁদ। পাখিরা আড়মোড়া ভাঙছে, এখনও তারা বাসা ছাড়েনি।

শুনশান ভি আই পি রোড ধরে ছুটছিল লাল মারুতি। কাঁটায়-কাঁটায় সত্তর কিলোমিটার বেগে। গাড়ি চালাচ্ছে পার্থ, পিছনে মিতিন, টুপুর। একটু আগেও মিতিন সামনে ছিল, উলটোডাঙার মোড়ে জায়গা বদল করল। ফাঁকা রাস্তায় সামনের সিটের লোককে নাকি মানুষ আগে নজর করে।

রাত থাকতে উঠেছে টুপুর, কিন্তু চোখে তার ঘুমের লেশমাত্র নেই। কেসের অন্তিম মুহূর্ত প্রায় এসে গেল, উত্তেজনায় সে টানটান। তাকাচ্ছে ইতিউতি।

পার্থর দৃষ্টি ঘোরাফেরা করছিল রেয়ারভিউ মিররে। বেশ সংশয়ের সুরে বলল, "ব্যাপারটা কী হল? পিছনে রুস্তমজির গাড়ি তো দেখা যাচ্ছে না?"

"উনি উলটোডাঙা থেকে পাঁচ মিনিট পরে রওনা দিয়েছেন। একই স্পিডে চালাচ্ছেন গাড়ি।"

"এমন নির্দেশ কেন?"

"বুদ্ধিটা সামান্য খাটাও, বুঝে যাবে।"

"দুটো গাড়ির মধ্যে যথেষ্ট ফারাক রাখতে চাও, তাই তো?"

"প্লাস, গন্তব্যস্থলটি রুস্তমজির মিনিট পাঁচেক আগে আমাদের পেরোতে হবে। কারণ, বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়েতে যত্রতত্র গাড়ি ঘোরানো যায় না। ডিভাইডারের নেক্সট কাটিং পর্যন্ত গিয়ে গাড়ি টার্ন করাতে একটু সময় লাগে। ওই টাইমটুকু হাতে রাখা দরকার।

"অ!"

ভি আই পি ছেড়ে গাড়ি এবার যশোর রোডে। ডাইনে বিমানবন্দর। বিকট শব্দ তুলে একটা ভোরের প্লেন আকাশে উড়ল। ভেসে চলেছে পশ্চিম পানে। এরোপ্লেনটা মিলিয়ে যাওয়ার আগেই এসে পড়ল বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে।

পার্থ ফ্লাইওভারে উঠছিল। মিতিন বলল, "লোকেশনটা খেয়াল আছে তো?"

"ইয়েস ম্যাম। বাঁয়ে লাল সাইনবোর্ড। টায়ারের বিজ্ঞাপন।"

"ঠিকঠাক চালিয়ো। ওখানে যেন স্পিড কমিয়ো না।"

"দাঁড়াও। আগে দ্যাখো, ওখানে আদৌ কেউ আছে কিনা। এখনই হয়তো রুস্তমজিকে ফোন করে বলবে, আমরা বালি ব্রিজে থাকব!"

"উঁহুঁ। ওরা আর ঝুঁকি নেবে না। নার্ভাস হয়েছে, এখন কোনওমতে টাকাটা হাতাতে পারলে বাঁচে। নইলে সময়টা দুম করে এগিয়ে আনত না।"

টুপুর ঘড়ি দেখল, পাঁচটা বাজতে সাত। "আমরা আগে চলে এলাম না তো?" বলতে গিয়ে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, "না না, ওই তো... ওই তো কালো হন্ডা সিটি।"

"দেখেছি।" মিতিন ঈষৎ উত্তেজিত স্বরে বলল, "চটপট মাথাটা নামিয়ে নে।"

তেমন মনঃপূত না হলেও বাধ্য সৈনিকের মতো আদেশ পালন

STD

করল টুপুর। মিনিটখানেক পর ঘাড় উঁচিয়ে বলল, "ধুস, কোনও মানে হয়? গাড়িটায় কে আছে দেখাই তো হল না!"

"অধৈর্য হোস না টুপুর। কিচ্ছু পালাবে না। আমরা এক্ষুনি ওখানে ফিরছি।"

কিন্তু পথবিভাজিকার পরবর্তী ছেদ এল প্রায় চার কিলোমিটার গিয়ে এবং এমনই কপাল, সেখানে গাড়ি ঘোরাতেই সামনে একটি ট্রাক। হর্ন দিলেও পথ ছাড়ছে না। চলেছে গজেন্দ্রগমনে। অসহায় ক্ষোভে মাথা ঝাঁকাল পার্থ। মিতিনের মুখ থমথমে। চোয়াল শক্ত হচ্ছে ক্রমশ।

বেশ খানিকটা দূর থেকে ফের নজরে পড়ল কালো হন্ডা সিটি! ঠিক তার পিছনেই রুস্তমজির গাড়ি। এবং রুস্তমজি কেমন উদ্‌ভ্রান্তের মতো দাঁড়িয়ে।

ঘ্যাচাং ব্রেক কষে মারুতি থামাল পার্থ। সঙ্গে-সঙ্গে নেমেও পড়ল সকলে। রাস্তা টপকে ছুটল ওপারে।

রুস্তমজির সামনে গিয়ে মিতিন বলল,"কী হল কেসটা? গাড়ি রয়েছে, অথচ...!"

বিহ্বল মুখে রুস্তমজি বললেন, "গাড়িটা ফেলে রেখে গেল।"

"মানে?"

"পালিয়েছে।"

"ক'জন ছিল?"

"প্রথমে একজনই। কালো কাপড়ে মুখ ঢাকা। গাড়ি থেকে নেমে ব্যাগ চাইল, দিয়ে দিলাম। অমনি পিছন থেকে একটা মোটরবাইক। ব্যাগ নিয়ে মোটরবাইকে ব্যাক করে গেল দু'জনে।"

টুপুর চেঁচিয়ে উঠল, "আর রনি?"

"জানি না। রনিকে তো দিল না।"

"গাড়িটা দেখেছেন?"

"হ্যাঁ। রনি নেই। সামনের সিট, পিছনের সিট, দুটোই তো ফাঁকা।"

পার্থ কালো গাড়ির জানলায় উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল। নীলচে কাচের ওপারে কিছু ঠাহর করা কঠিন। কী ভেবে দরজার হ্যান্ডেলটা টানল। খুলে গেল দরজা।

এবং কী কাণ্ড! আছে, আছে, রনি আছে। পিছনের সিটের তলায় অঘোরে ঘুমোচ্ছে রনি।

রুস্তমজি প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে তুললেন ছেলেকে। কোলে নিয়ে ডাকলেন, "রনি, রনি, বেটা...!"

মিতিন ঠান্ডা গলায় বলল, "রনি এখন জাগবে না রুস্তমজি। ওকে হেভি ডোজে ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে। আপনি বরং ওকে নিয়ে গাড়িতে বসুন।"

রুস্তমজি তবু দাঁড়িয়ে আছেন। ছেলে কোলে। রীতিমতো অসন্তুষ্ট স্বরে বললেন, "কিন্তু শয়তানদের তো ধরা গেল না? আপনি আমায় কথা দিয়েছিলেন...!"

"তারা আমার হাতের মধ্যেই আছে, মিস্টার জরিওয়ালা। আপাতত গাড়িটাকে একবার সরেজমিন করছি। আমার সিক্সথ সেন্স বলছে, গাড়িতে আর-একজন আছে।"

বলেই কালো গাড়ির ডিকি খুলল মিতিন। কীমাশ্চর্যম! সত্যিই সেখানে একটা লোক। দু'হাত পিছমোড়া করে বাঁধা, মুখে কাপড় গোঁজা এবং রনির মতোই অচেতন।

রুস্তমজি হতবাক মুখে বললেন, "এটি কে?"

"ওই হন্ডা সিটির ড্রাইভার। শয়তানরা একেও আটকে রেখেছিল। রনির সঙ্গে ড্রাইভার আর ভাড়া করা গাড়ি, দু'ইই খালাস করে দিয়েছে।"

"ভাড়ার গাড়ি?"

EIVR

"হ্যাঁ, অবিকল আপনার হন্ডা সিটির মতো দেখতে তো, তাই এই গাড়িটাই ওরা ইউজ় করেছিল। ধোঁকা দিয়ে রনিকে কিডন্যাপ করার জন্য।"

"ও মাই গড!"

মিতিন ঘুরে পার্থকে বলল, "অ্যাই এসো, ধরাধরি করে লোকটাকে বের করি। দড়িদড়াগুলো খোলো। এখানে তো ফেলে রাখা যায় না, ও আমাদের সঙ্গেই চলুক। সজ্ঞানে এলে ওকে অনেক পুলিশি জেরা সামলাতে হবে।"

"আর গাড়িখানার কী গতি?"

"থাকুক পড়ে। লক করে অনিশ্চয়দাকে জানিয়ে দিচ্ছি, লোকাল থানা এসে নিয়ে যাবে। তারপর গাড়ি ছাড়ানো দ্বিজেন হালদারের দায়।"

"দ্বিজেন হালদার?" রুস্তমজির চোখ বড়-বড়। "নামটা খুব চেনা-চেনা লাগছে!"

"ওয়েট করুন, এবার অনেক কিছুই চেনা লাগবে।"

একটা অর্থপূর্ণ হাসি ছুড়ে দিয়ে মিতিন নেমে পড়ল কাজে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ঘুমন্ত ড্রাইভার চালান হল মারুতিতে। পার্থ তাকে নিয়ে পিছনে বসল। টুপুর আর মিতিন সামনে।

সিট-বেল্ট বাঁধতে-বাঁধতে মিতিন রুস্তমজিকে বলল, "এবার আপনি আমাদের ফলো করুন।"

রনিকে গাড়ির সিটে শুইয়ে লীলাকে ফোন করছিলেন রুস্তমজি। মোবাইলটা মুখ থেকে সরিয়ে বললেন, "কোথায় যাব? লীলা তো শুনেই ছটফট করছে! এক্ষুনি রনিকে দেখতে চায়।"

"আর-একটু অপেক্ষা করতে বলুন। জানিয়ে দিন, কালপ্রিটদের গারদে পাঠিয়ে আপনি বাড়ি ফিরছেন।"

"কালপ্রিটদের আর কোথায় পাবেন?"

"বললাম যে, এখনও মুঠোয় আছে। চলুন, এবার এগোই।"

মিতিনের বলার ভঙ্গি এত দৃঢ় যে, রুস্তমজি আর কথা বাড়ালেন না। দ্রুত ফোনালাপ সেরে উঠলেন গাড়িতে। লাল মারুতিকে অনুসরণ করছে বি এম ডব্লিউ। ফের যশোর রোড। ফের ভি আই পি রোড। তারপর রাজারহাট নিউটাউনে ঢুকল গাড়ি। ক্রমশ সল্টলেকের দিকে এগোচ্ছে। অবশেষে এ-বি ব্লকের একটি পুরনো দোতলা বাড়ির সামনে দাঁড়াল।

গাড়ি থেকে নেমে রুস্তমজি হাঁ, "এ কী! এ তো অশোকবাবুর বাড়ি!"

"হ্যাঁ। আপনার বিশ্বস্ত প্রাইভেট সেক্রেটারি!" মিতিনের ঠোঁটে তির্যক হাসি। কেটে-কেটে বলল, "বিস্ময়টা ঝেড়ে ফেলুন মিস্টার জরিওয়ালা। এখন শুধু আপনার নীরবে দেখে যাওয়ার পালা। আসুন।"

"কিন্তু রনি একা গাড়িতে...।"

"ভয় নেই। প্রোটেকশনের ব্যবস্থা আছে।"

বলেই মিতিন হনহনিয়ে অশোক মজুমদারের দরজায়। পাশেই বাড়ির গ্যারাজ, শাটার নামানো। সেদিকে দেখল তাকিয়ে-তাকিয়ে। আঙুল রাখল ডোরবেলে।

পাল্লা খুললেন অশোক মজুমদার স্বয়ং। আগন্তুকদের দেখে যেন ভূত দেখার মতো চমকালেন। তোতলানো স্বরে বললেন, "আ আ...আপনারা?"

"আপনার স্যারের সঙ্গে চলে এলাম। ভিতরে ঢুকতে বলবেন না?"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।" অশোক মজুমদার সন্ত্রস্ত চোখে একবার দেখলেন গাড়ি দুটোকে। ঢোক গিলে বললেন, "প্লিজ কাম।"

অন্দরে পা রেখে মিতিন সরাসরি বলল, "আপনার ভাইটি কোথায়?"

"কোন ভাই?"

"সুজয়। সুজয় মজুমদার। যিনি মিস্টার জরিওয়ালার অফিস থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন টাকা চুরির অপরাধে?"

"সে আলাদা থাকে, দোতলায়। আমার সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই।"

"তাই বুঝি?" মিতিনের স্বরে ব্যঙ্গ, "মুখ দেখাদেখিও বন্ধ নাকি? ডাকতেও পারবেন না?"

"আমি ওর সঙ্গে কথা বলি না। ও একেবারেই উচ্ছন্নে গিয়েছে।"

"জানি। এখন সে বাচ্চা কিডন্যাপিং-এর ব্যাবসায় নেমেছে। আপনার মালিকের একমাত্র পুত্রটিকে অপহরণের অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করতে এসেছি।"

"কী বলছেন ম্যাডাম?" অশোক মজুমদার যেন আকাশ থেকে পড়লেন, "রনি কিডন্যাপড হয়েছিল নাকি? সুজয় করেছিল?"

"বাচ্চাটা এই বাড়িতে আড়াই দিন আটক রইল, এখান থেকে ভোরে বের করা হল তাকে... অথচ আপনি কিছুই টের পাননি, তাই না?"

"বিশ্বাস করুন, আমি এই কুকাজের বিন্দুবিসর্গ...! ভাবতেই পারছি না, ভাবতেই পারছি না। রনি এখন কোথায়?"

জবাব দিতে হল না মিতিনকে, তার আগেই বাইরে হালকা শোরগোল। প্রায় তৎক্ষণাৎ দুটো লোককে কলার ধরে টানতে-টানতে ঘরে ঢোকালেন এক পুলিশ অফিসার। সঙ্গে তাঁর চার বন্দুকধারী।

অমনি প্রায় লাফিয়ে উঠলেন রুস্তমজি, "এই তো, এই তো সুজয়।"

"খানিক আগে মুখে কালো কাপড় জড়িয়ে ইনি এক কোটি টাকা হাতিয়ে ছিলেন, মিস্টার জরিওয়ালা।"

চোয়াড়ে চেহারার অন্য লোকটির দিকে আঙুল দেখাল মিতিন, "এঁকে চিনতে পারছেন? ইনিই মোটরবাইকে সুজয়কে উঠিয়েছিলেন।"

"ঠিকই তো। এই হলুদ টি শার্ট, নীল জিন্‌স...!"

"দু'জনেই পাঁচিল টপকে পালাচ্ছিল ম্যাডাম।" ভুঁড়িওয়ালা পুলিশ অফিসারটির গলা গমগম করে উঠল। তৃপ্ত মুখে বললেন, "নিয়ে গিয়ে ভ্যানে তুলি?"

"কোথায় রেখেছেন আপনাদের গাড়ি?"

"যেমনটি আই জি সাহেব নির্দেশ দিয়েছেন। পরের রাস্তাটায়।"

"একটু দাঁড়ান। এই লোকটির কোমরেও দড়ি পরাতে হবে।"

মিতিন অশোক মজুমদারের দিকে এগোল, "ইনিই হলেন নাটের গুরু। অপহরণকাণ্ডের মূল মস্তিষ্ক। মিস্টার জরিওয়ালার টাকা এখন এঁরই জিম্মায়।"

কাঁপা-কাঁপা গলায় অশোক মজুমদার বললেন, "আমায় টানছেন কেন? আমি কী জানি?"

"খুলে বলতে হবে? রনিকে অপহরণের দিন বেলা আড়াইটেয় তারককে পাঠালেন রনির স্কুলে। হাতে ধরিয়ে দিলেন চশমার বিলখানা। ভাল মতোই জানতেন, তিনটের আগে চশমা ডেলিভারি হবে না এবং সেটি নিয়ে তারকের পক্ষে সাড়ে তিনটের আগে সেন্ট পিটার্স স্কুলে পৌঁছোনো সম্ভব নয়। আগেই আপনার গুণধর ভাইকে দিয়ে ফোন করিয়েছিলেন দ্বিজেন হালদারকে, মিস্টার জরিওয়ালার কোম্পানির নাম করে। আপনাদের অর্ডারমাফিক কালো হন্ডা সিটি চলে গেল বেলেঘাটার টাওয়ার অফ সাইলেন্সে। তারপর সুজয় আর ওই বজ্জাতটি তিনটের আগে সেন্ট পিটার্সের গেটে হাজির। নকল আই-ডি কার্ড আগেই বানানো ছিল। মিস্টার জরিওয়ালার বাড়িতে যাওয়া-আসার সুবাদে সুজয়ও রনির পরিচিত, সুতরাং নির্বিবাদে বাচ্চাটিকে গাড়িতে তুলতে কোনও অসুবিধেই নেই। ছক কষে বউ-

ছেলেমেয়েকে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছেন শিলিগুড়িতে। অতএব রনি এবং হন্ডা সিটির ড্রাইভারটিকে নির্বিঘ্নে বাড়িতে বন্দি রাখলেন। নিজস্ব সানত্রো গাড়িটিকে টুকিটাকি সারাইয়ের অজুহাতে চালান করলেন কারখানায়। তার জায়গায় আপনার গ্যারাজে লুকোনো রইল কালো হন্ডা সিটি। কী, ঠিক বলছি তো?"

"একেবারেই না। এসব আজেবাজে গল্প ফাঁদার কোনও মানেই হয় না।" অশোক মজুমদার এবার রীতিমতো ক্ষিপ্ত, "দেখুন না গ্যারাজ খুলে, হন্ডা সিটি আছে কি না!"

"থাকার তো কথা নয়। এখন তো ওখানে শোভা পাচ্ছে একটি মোটরবাইক আর সাইকেল।"

মিতিন বাঁকা হাসল, "সাইকেল চেপে টেলিফোন বুথে যাওয়ার বুদ্ধিটা কিন্তু অভিনব। মনে হবে, আরোহীরা আশপাশেরই বাসিন্দা। অথচ আদতে তারা আসছে সল্টলেক থেকে, ফুটব্রিজ ব্যবহার করে। তবে আপনার চালাকিটা অবশ্য শেষ পর্যন্ত কাজে লাগল না, মিস্টার মজুমদার। প্রথমবার ফোনে রনির কান্নার টেপ শোনানোর আইডিয়াটাও বেশ কাঁচা। আপনার মতো ধুরন্ধর মানুষের কাছে এটা আশা করা যায় না।"

"আপনি কিন্তু লিমিট ছাড়িয়ে যাচ্ছেন ম্যাডাম। একজন ভদ্রলোককে আপনি অপমান করছেন।"

"ভদ্রলোকের মুখোশ পরে থাকলেই ভদ্রলোক হওয়া যায় না, মিস্টার মজুমদার।"

"খুবই আপত্তিকর কমেন্ট," অশোক মজুমদারের নাকের পাটা ফুলল। দাঁতে দাঁত ঘষে রুস্তমজিকে বললেন, "এই মহিলাকে সংযত হতে বলুন স্যার। ভাই অপরাধ করলে দাদাকেও দোষী ধরা হবে, এ কেমন কথা? উনি যে অভিযোগ আনছেন, প্রমাণ করতে পারবেন?"

"প্রমাণ না রাখার চেষ্টা অবশ্য আপনি চালিয়েছেন আগাগোড়া।

সম্ভবত রনি কিংবা ড্রাইভারটিকেও আপনি দর্শন দেননি। বেমালুম ঠান্ডা মাথায় অফিস যাচ্ছেন, কাজকর্ম করছেন। আপনাকে সন্দেহের অবকাশই বা কোথায়?" মিতিন চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, "কিন্তু অপরাধীরা যে একটা মোক্ষম ভুল করেছে মিস্টার মজুমদার!"

"কী? কী করেছি?"

"আপনি নয়, ভুলটা আপনার ভাইয়ের। শাগরেদকে দিয়ে মুক্তিপণ দাবি করানোর পর-পরই উৎসাহের আতিশয্যে সে একটি কল করেছিল আপনার মোবাইলে। বাঙ্গুর অ্যাভেনিউয়ের বুথ থেকে। সেটি কিন্তু আমার রেকর্ডে আছে। পুলিশেরও। ওই বুথ থেকে ছ'টা পঁয়ত্রিশে কেন আপনাকে ফোন করা হয়েছিল, তার কারণ দর্শাতে পারবেন তো?"

জোঁকের মুখে বুঝি নুন পড়ল। অশোক মজুমদারের সমস্ত জারিজুরি খতম। কাটা কলাগাছের মতো আছড়ে পড়লেন সহসা। জড়িয়ে ধরলেন রুস্তমজির পা। কপাল ঠুকছেন আর বলছেন, "অন্যায় করেছি স্যার। পাপ করেছি স্যার। ক্ষমা করে দিন স্যার। মাথার ঠিক রাখতে পারিনি স্যার।"

একটি শব্দও ফুটল না রুস্তমজির গলায়। না ক্ষোভ, না রাগ, না বিরক্তি। এক পা, এক পা করে সরে এলেন। বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে। ধীর পায়ে।

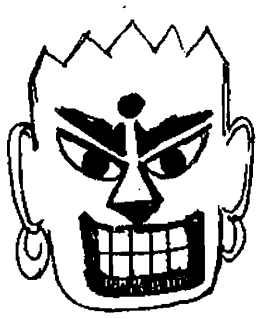

নৈশাহারটি মন্দ হল না আজ। বিপুল আয়োজন করেছিলেন রুস্তমজি। কাবাব, ফ্রাই, রোস্ট, তন্দুর, সঙ্গে অঢেল পরোটা, নান।

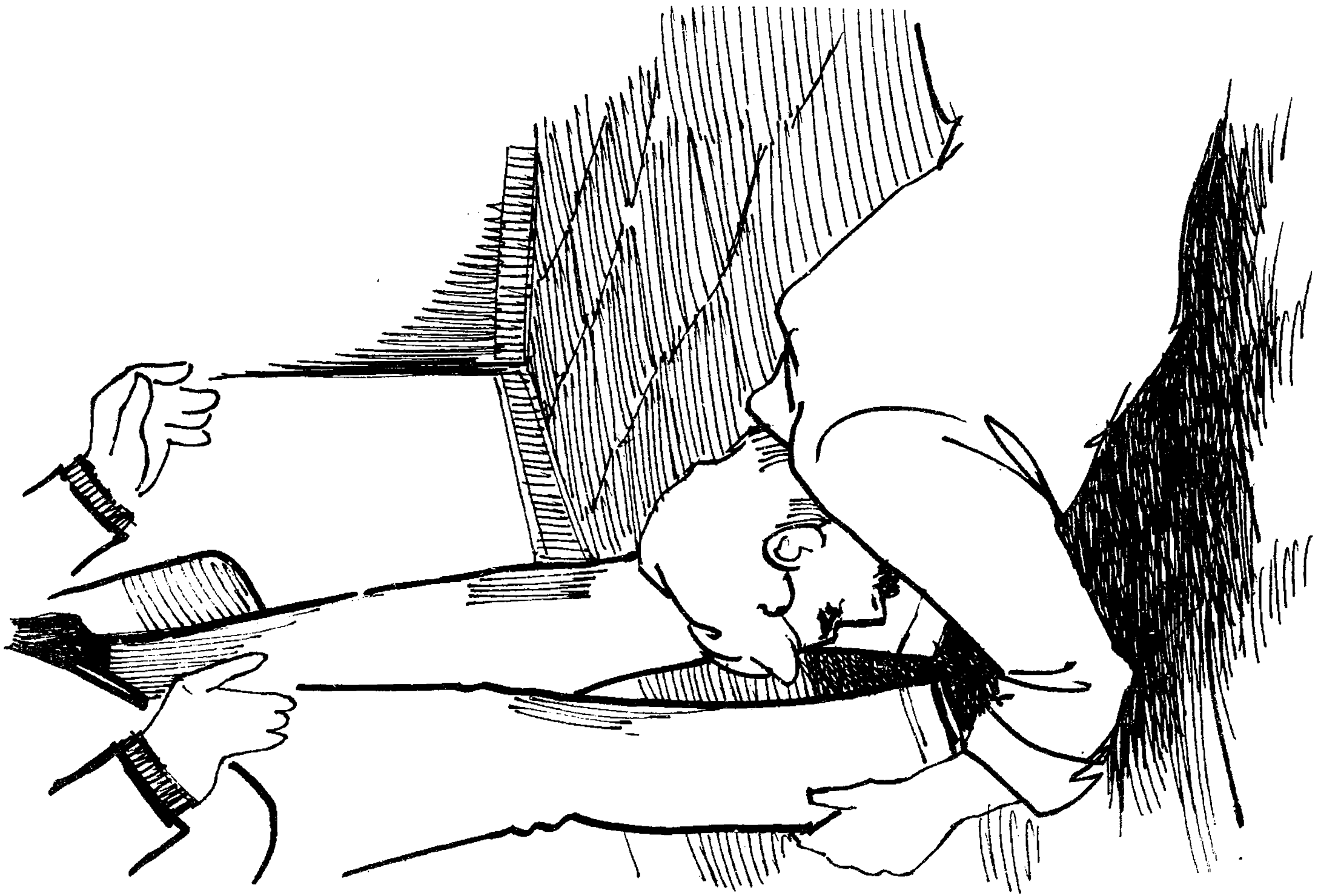

স্বহস্তে সিমুইয়ের মিষ্টি বানিয়েছিলেন লীলা। খাব না, খাব না করেও অনেকটা খেয়ে ফেলল টুপুর। আর পার্থর তো আজ পোয়াবারো। মুখ তার চলছে তো চলছেই। মিতিন না থামালে তাকে বোধহয় ক্রেন দিয়ে চেয়ার থেকে তুলতে হত।

রনি এখনও স্বাভাবিক হয়নি পুরোপুরি। কথাবার্তা বলছে বটে, তবে মাঝে-মাঝেই চমকে-চমকে উঠছে। টুপুর আর বুমবুম অবশ্য তার সঙ্গে কম্পিউটার গেমস খেলল কিছুক্ষণ। বুমবুমের হইহল্লাতেই যা রনির সাড় ফিরছিল খানিকটা। বাচ্চারাই তো বাচ্চাদের মন ভাল করার সবচেয়ে বড় ওষুধ।

বিদায় নেওয়ার সময় রুস্তমজি টুপুরদের সঙ্গে এলেন নীচে। মিতিনকে একটা রঙিন খাম বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "এটা রাখুন। আমার আর লীলার তরফ থেকে একটা সামান্য উপহার।"

মিতিন খামটা দেখল। কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কভারে এটা কী লেখা আছে, মিস্টার জরিওয়ালা? আফজুড... আফজুন... আফজায়াদ...!"

"ওটা পারসি ভাষায় কুশল প্রার্থনা। উপহার দেওয়ার সময় আমরা প্রাপকের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করি।"

"থ্যাঙ্ক ইউ। অনেক-অনেক ধন্যবাদ।"

গাড়িতে উঠে টুপুরের আর তর সইছিল না। হ্যানোভার কোর্টের গেট পেরিয়েই খুলল খামটা। উল্লসিত স্বরে বলল, "ওয়াও! এ যে পাঁচ-পাঁচ লাখ টাকার চেক গো!"

মিতিন খুশি-খুশি মুখে বলল, "এত দিয়েছেন?"

পার্থ গিয়ার বদলাতে-বদলাতে টুকুস মন্তব্য ছুড়ল, "বেশি কোথায়? ভদ্রলোক তো নিট পঁচানব্বই লাখ মুনাফা করলেন।"

"মানে?"

"এক কোটি তো গিয়েইছিল, তার থেকে ফাইভ পারসেন্ট ছাড়লেন। এনিওয়ে, টাকাটার উপযুক্ত ব্যবহার তো হতেই পারে।"

"কীভাবে?"

"চলো, পুজোয় এবার কন্টিনেন্ট টুর মেরে আসি। ফ্রান্স, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, ইতালি। চাইলে লন্ডনটাও ছুঁয়ে আসতে পারি।"

"সে দেখা যাবে'খন।" বুমবুম ঢুলছে, তার মাথা কোলে টেনে মিতিন বলল, "আগে একটা সলিড ঘুম দেব। পরপর দুটো রাত যা টেনশনে কেটেছে।"

"টেনশনের ছিলটা কী? কেস তো প্রায় জোড়াতালি দিয়ে সল্‌ভ করলে।" পার্থ টিপ্পনী ভাসাল, "যে ব্রহ্মাস্ত্রে অশোক মজুমদারকে শেষমেশ বধ করলে, সেটা তো স্রেফ আন্দাজ!"

"আজ্ঞে না স্যার। প্রজ্ঞাপারমিতা মুখার্জি প্রমাণ ছাড়া কাজ করে না। কাল দুপুরে আমি বেড়াতে যাইনি। অশোক মজুমদারের মোবাইলের কললিস্ট জোগাড় করছিলাম। ওটা ঘাঁটতেই তো ফোন বুথের নাম্বারটা বেরিয়ে এল।"

টুপুরের ভুরু জড়ো হল, "তুমি অশোক মজুমদারের মোবাইল নাম্বার পেলে কোত্থেকে?"

"গেস কর।"

"রুস্তমজি?"

"উঁহু।"

"তা হলে তারক...?"

"হল না।"

"আর কে হতে পারে?" টুপুর মাথা চুলকোচ্ছে।

"পারলি না তো?" মিতিন ঝটাক্‌সে ব্যাগ থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড বের করল, "দিস ইজ দ্য সোর্স মাই ডিয়ার। কাল অশোক

মজুমদার যখন আমার স্লিপ দিতে রুস্তমজির ঘরে ঢুকেছিলেন, তখন তাঁর এই কার্ডটি আমি গায়েব করেছিলাম।”

“তুমি কি তখনই অশোক মজুমদারকে সন্দেহ করেছিলে?”

“অনেকটাই। কারণ, স্কুলে গাড়ি পাঠানোটা ওঁর দায়িত্ব। অতএব দেরিতে যদি গাড়ি পৌঁছোয়, দু'জন প্রধান সাসপেক্ট থাকে। একজন তারক, অন্যজন অশোক। ঠিক কি না?”

“তা তারককে বাদ দিলে কী হিসেবে?”

“স্টেটমেন্টে ফাঁক খুঁজে পাইনি, তাই। যদি তারক দলে থাকতেন, তা হলে চশমার দোকানের গল্পটা বলতেন কি? ট্রাফিক জ্যামের অজুহাত দেওয়াই তো স্বাভাবিক ছিল। এবং মোবাইলে অশোক মজুমদার যে তাঁকে কল করেছিলেন, সেটাও চেপে যেতেন। অশোক মজুমদারকে তোর-আমার গল্পটাও তারক শুনিয়েছেন বটে, তবে তা হয়তো নিজের অজান্তেই। অশোক মজুমদারই কৌশলে কথাটা বের করে নিয়েছিলেন।”

“একটা কথা বলব মিতিনমাসি? কললিস্ট চেক করে অশোক মজুমদারকে যখন ধরেই ফেললে, ফালতু-ফালতু বিকেলে আর পারসি ক্লাবে গেলে কেন?”

“প্রয়োজন ছিল রে। একটা ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হতে চাইছিলাম। অশোকবাবুই কুকীর্তির নায়ক, নাকি পিছনে কোনও মেঘনাদ আছে?”

“জিমির খবর নিতে চাইছিলে?”

“যে-কোনও জ্ঞাতিশত্রুর কথাই ভাবনায় ছিল। হয়তো বা জিমিও। তবে জিমি মুম্বই থেকে এসে ভাইপোকে ইলোপ করবে, তাও মাত্র এক কোটি টাকার জন্য, এটা একেবারেই অবাস্তব চিন্তা।”

“দুনিয়ায় সবই ঘটে, বুঝলে!” পার্থ মাথা দোলাল, “এই

অশোক মজুমদারকেই ধরো না। কতদিনের বিশ্বাসী কর্মচারী। চাকরিটা যথেষ্ট ভাল। নিজস্ব বাড়ি-গাড়ি আছে, মাস গেলে অন্তত চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা মাইনে। লোভে পড়ে তাঁরও মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি চাপল তো! সোনার ডিমের জন্য আস্ত হাঁসটাকেই জবাই করতে যাচ্ছিলেন।"

"শুধু লোভ নয় মেসো, এখানে প্রতিশোধস্পৃহাও একটা ফ্যাক্টর।" টুপুর ফুট কাটল, "ভাই যে দোষই করুক, তার বরখাস্ত হওয়াটা নিশ্চয়ই অশোকবাবু মানতে পারেননি। অপমানে ধিকিধিকি জ্বলছিলেন। সুজয় হয়তো সেই আগুনে ঘি ঢেলেছিল।"

"না রে টুপুর, রক্তে অপরাধ প্রবণতা থাকলে তবেই এ ধরনের কুকাজ করা সম্ভব। চেহারায়, আচার-আচরণে, যতই সভ্যভব্য হোক, সময়-সুযোগ পেলে এদের আসল রূপটা ফুটে বেরোবেই। না হলে ভাব তুই, এত সুন্দর প্ল্যান করে, হিসেব কষে, ওইটুকু একটা বাচ্চাকে কেউ গুম করতে পারে?"

মিতিনমাসি ঠিকই বলছে। টুপুরের একটা শ্বাস পড়ল। সত্যি, মানুষকে চেনা বড় কঠিন!

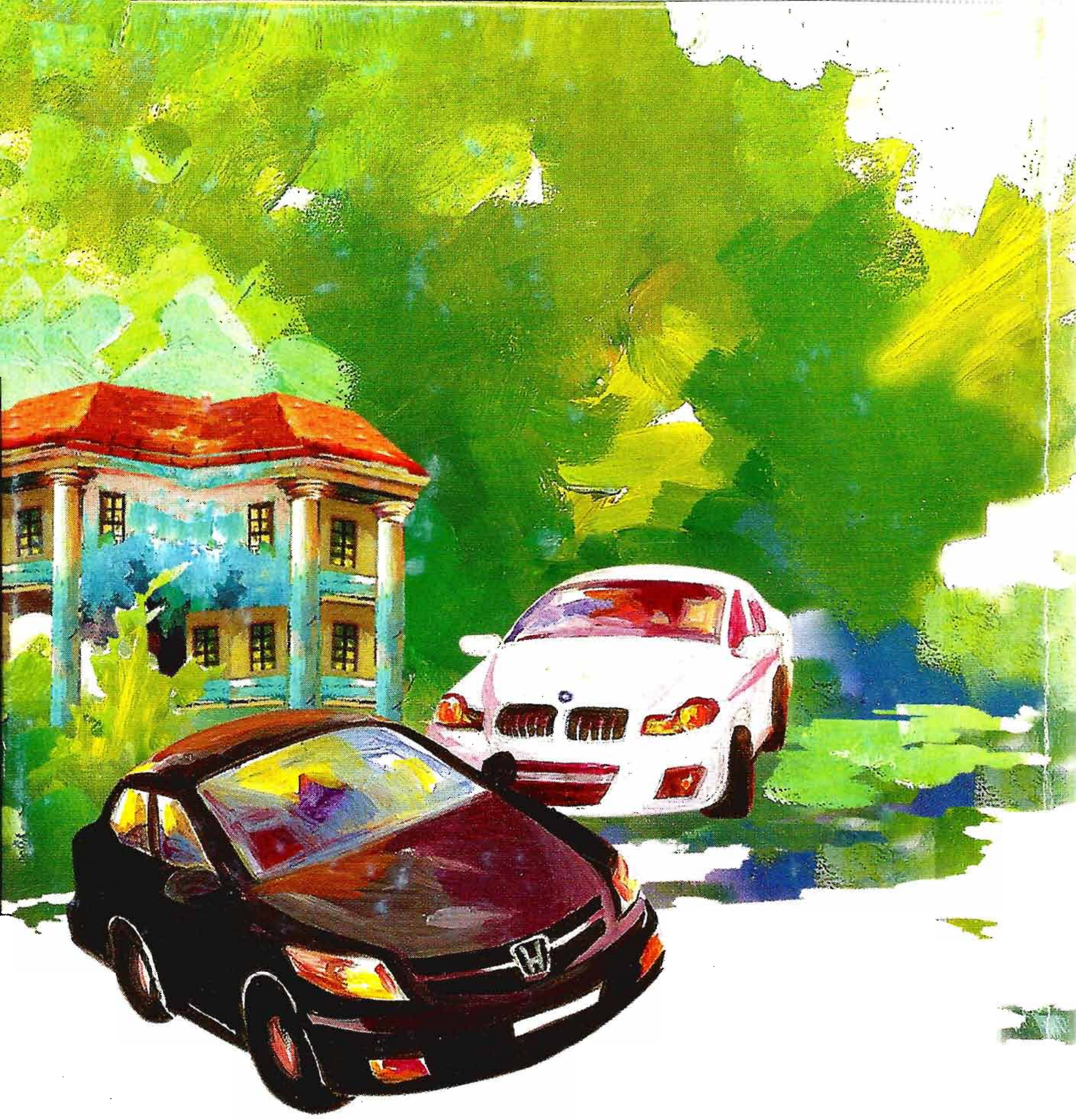

9 789350 400159